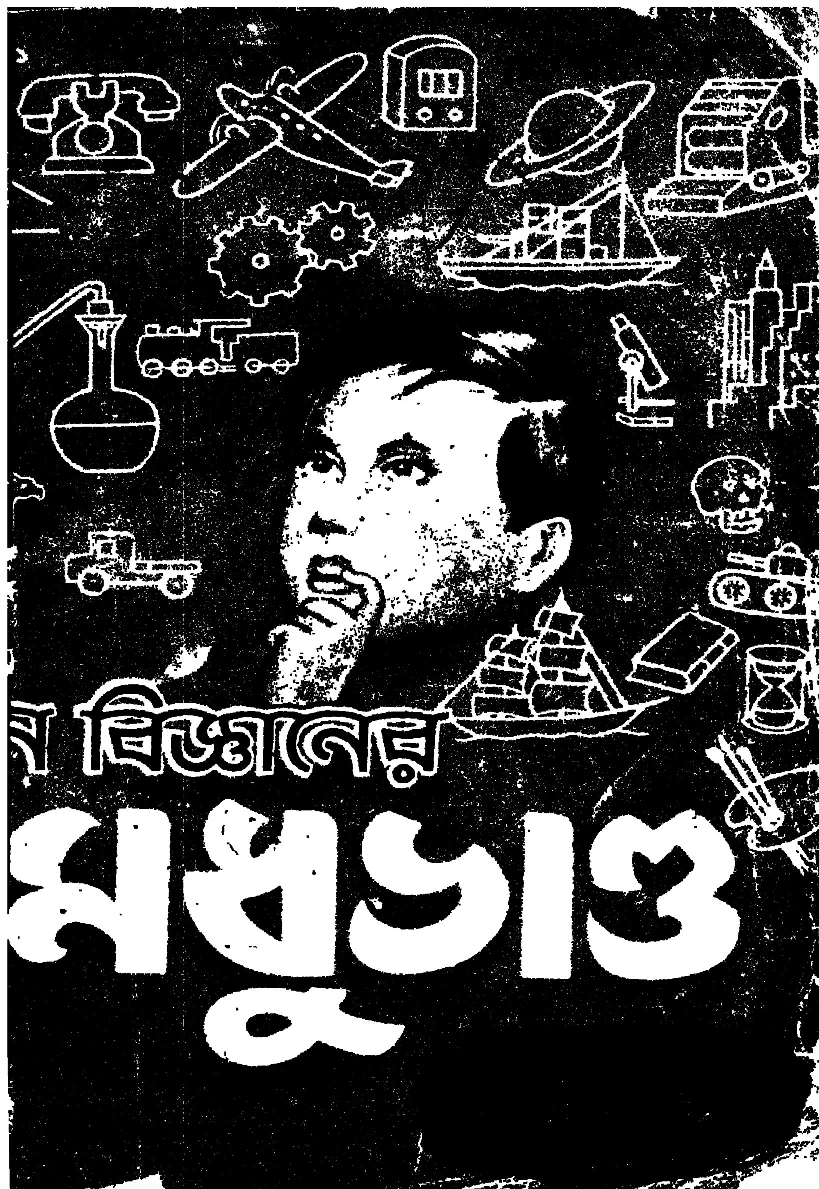

বিজ্ঞানের

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

প্রথম ভাগ—পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মৌমাছি

বপুর কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্নোলজির সুপ্রসিদ্ধ
অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল রায়, এম-আই-কেম্-ই, এ-বি
(হার্ভার্ড), ডক্টর, ইং (বার্লিন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বাদশ সংস্করণ

এক টাকা দশ আনা

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস ১৮৬।১ আপার সারকুলার রোড হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

যাঁর উপদেশ ও সুপরামর্শের সাহায্যে
'আনন্দ-মেলা'র পরিচালনায় সকলের প্রীতির পাত্র হয়েছি
'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সেই সুযোগ্য প্রধান সম্পাদক
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের
করকমলে
আমার অকপট শ্রদ্ধার অঞ্জলি
'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' দিলাম।
'মৌমাছি'
১৫।৯।৪১

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

প্রথম ভাগ

১ম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৪১

২য় সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪১

৩য় সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৪২

৪র্থ সংস্করণ—মে ১৯৪৩

৫ম সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৩৪

৬ষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫

৭ম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

৮ম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪৯

৯ম সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৫১

১০ম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

১১শ সংস্করণ—জুলাই ১৯৫৪

১২শ সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৫৫

দ্বিতীয় ভাগ

১ম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪১

২য় সংস্করণ—জুন ১৯৪২

৩য় সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৪৩

৪র্থ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

৫ম সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৪৫

৬ষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭

৭ম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৫০

৮ম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

ভূমিকা

অনুসন্ধিৎসা জীবন্ত মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মন যতদিন সজাগ থাকবে জ্ঞান লাভের পিপাসা ততদিন নিবৃত্ত হবে না। এই ভাবের অভাব হলেই বুঝতে হবে যে মানসিক জড়তা এসেছে। শিশু কথা বলতে শিখলেই তার মন নতুন জগতের পরিচয় লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং প্রশ্নে প্রশ্নে তার আশপাশের সকল লোককে অস্থির করে তোলে। অনেকে বিরক্ত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন—কতকটা নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করার জন্য। কিন্তু এইভাবে শিশুর জিজ্ঞাসু মনকে দমিয়ে দিলে তার মানসিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটানো হয়। এটা কোন প্রকারে বাঞ্ছনীয় নয়। যথা সম্ভব জ্ঞানলাভে তাকে উৎসাহিত করাই উচিত। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। অনায়াসলব্ধ জ্ঞান বা বস্তুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না; প্রশ্ন করা মাত্রই উত্তর দিলে শিশুর জ্ঞান বাড়তে পারে কিন্তু তার চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, চিন্তা-শক্তির বিকাশ জ্ঞানলাভের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয়। মনের অলসতা দূর করার জন্য শিশুকে পরিশ্রম করতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বাধ্য করা দরকার। প্রশ্নের উত্তর তার নিজের চিন্তাশক্তি দিয়ে সমাধান করাতে পারলেই ভাল; যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ যেখানে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে সেই ভাণ্ডার তাকে দেখিয়ে দিতে হয়। জগতের সব দেশের ছোটদের জন্যেই এই রকম

'জ্ঞান-ভাণ্ডার' লেখা হয়েছে সহজ এবং সরল করে। আমাদের বাংলা ভাষায় এই রকম বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। যে দু'চারখানি আছে, তাতে প্রশ্ন-সংখ্যার শেষ নেই, কিন্তু জবাবগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছি' আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগে সাধারণ জ্ঞানের জবাব দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, কাজেই তাঁর সঙ্কলিত "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" বইটি পড়ার পর একথা আমি বলতে পারি যে এই বই সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর করবে। শিশু-সাহিত্যের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বইগুলির বিষয়নির্বাচন, লিখনপ্রণালী ও রচনাপদ্ধতি প্রশংসনীয় নয়। এ বইটি সেদিক থেকে আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে, কারণ বিজ্ঞানের জটিল তথ্যকে সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা লেখকের প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে—বিষয় নির্বাচন ও পরিকল্পনার দিক থেকেও "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" সাধারণ জ্ঞানের একখানি অভিনব বই বলে গণ্য হবে। বইটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে এবং চিন্তাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করার উপযোগী সরঞ্জামও বিদ্যমান। আশা করি এই বইটি এদেশের ছেলেমেয়ে, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকসমাজ সকলের কাছেই আদর পাবে। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছি'র পরিশ্রম সার্থক হবে।

কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজি
যাদবপুর, ১৩।৯।৪১

শ্রীহীরালাল রায়

এই বইটির গোড়ার কথা

প্রায় দেড় বছর আগে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ তাঁদের পত্রিকায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য 'আনন্দ-মেলা' নাম দিয়ে সপ্তাহের একটি দিনে একটি পাতায় আনন্দের পরিবেশন করবেন ঠিক করেন এবং আমি 'মৌমাছি' ছদ্মনামের অন্তরালে সেই 'আনন্দ-মেলা'র পরিচালনাভার গ্রহণ করি। তখনই আমার মনে হয় যে, গল্প, ছড়া ও ছবি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি-পত্রের মারফৎ শিশু ও কিশোর মনের প্রশ্নগুলি জানা একান্ত দরকার এবং সাধ্যমত খেটে তাদের সেই কৌতূহলের সন্তোষজনক জবাব, সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, হয়তো দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জ্ঞানলিপ্সা বাড়তে পারে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বড়রা শিক্ষিত হলেও প্রশ্ন আর সমস্যাকে এড়িয়ে চলেন, কারণ ছোটবেলা থেকে তাঁদের মনের কৌতূহল বৃত্তিটিকে কোন দিনই বাড়তে দেওয়া হয়নি!—এর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি আমার নিজের জীবন থেকেই বলতে পারি—কারণ যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি বড়দের কাউকে কোনও প্রশ্ন করতাম তাহলে বকুনি খেতাম। স্কুলে মাস্টার মশাই রোজকার পড়া তোতাপাখীর মতো পড়িয়ে যেতেন বটে, কিন্তু পড়ার বইয়ের বাইরে কোনও প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করতাম তখনই মাস্টার মশাইরা বলতেন—"ডেঁপো, ফাজিল, ও দিয়ে তোমার কি হবে শুনি?"—একথা বর্ত্তমানের মাস্টার মশাইরাও যে অনেকেই বলেন, সে খবর পেয়েছি এই তুটি বছর দেশের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি পেয়ে। তাই আমি 'আনন্দ-মেলা'র চিঠির থলিতে আমার ছোট্ট বন্ধুদের মনের নানা রকম প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে শুরু করি এবং তাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেও অনেক কিছু শিখ্‌ছি ও শিখেছি—এবং আরও ভাল করে বুঝেছি যে কৌতূহলী মনের প্রশ্নের জবাবগুলি জানতে পারলে—অনায়াসে কি করে জ্ঞানলিপ্সা বেড়ে চলে। তাই মনে হয়েছে

বিশ্বমানবের এই কৌতূহলী মনকে খুশি করতে পারাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে মহত্তম কাজ; তাই, 'আনন্দ-মেলা'র বন্ধুদের কৌতূহলী প্রশ্নভরা চিঠিগুলি হয়ে উঠল আমার কাছে একটা মস্ত সম্পদ। আমি সেই চিঠিগুলির লেখকদের বয়সের সঙ্গে তাদের প্রশ্নের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের একটা তুলনামূলক তালিকাও প্রস্তুত করলাম। কারণ শিশু-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এর একটা বিশেষ দাম আছে। আমাদের দেশে অসংখ্য সাধারণ-জ্ঞানের বই থাকা সত্ত্বেও বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক আমার এই জবাবগুলিকে একত্র করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানালেন, কারণ তাঁদের মতে সে বইগুলিতে মনস্তত্ত্বের বিচারে ছোটদের মনের মাপ অনুযায়ী প্রশ্ন ও প্রশ্নের জবাব নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেই সব বইয়ের লেখকরা অসাধারণ পরিশ্রম করে রাশি রাশি প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে একটি বইয়ে কে কত বেশী প্রশ্নের জবাব কত দামে দিতে পারেন—সেই চেষ্টাই করেছেন; অথচ ছোটদের আনন্দ দিয়ে আগ্রহ জাগাতে পারে এমন কোনও ব্যবস্থার দিকে তাঁরা নাকি তেমন কোনও দৃষ্টি দেন নি। এর জন্য আমি তাঁদের কোনও দোষ দিই না, কারণ এ দেশের শিশু-সাহিত্য-লেখকদের মনের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনের সংযোগ রাখার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমি সে সুযোগ পেয়েছি বলেই হয়তো আমার জবাবগুলো শিশু-মনের খানিকটা উপযোগী হয়েছে এবং তাঁদের এই অভিজ্ঞতাটুকুর অভাবেই তাঁদের বইতে জবাবটা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বা জটিল। তাই সেই বইগুলি ছেলেদের হাতে দিলেও সেটা তাদের মনকে ষোলো-আনা খুশি করতে পারে না—তাদের কোনও আগ্রহ জাগায় না। সেই জন্য সে সমস্ত সাধারণ জ্ঞানের বই অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পাঠ্য তালিকায় দিলেও কেউ সেগুলি পড়ে না বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে বাজার-চলতি অধিকাংশ সাধারণ-জ্ঞানের বইতে প্রশ্নগুলি সাজাবার ব্যাপারেও খুব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ ঐ সমস্ত বইতে কোনও বর্ণানুক্রমিক সূচী না থাকায় চট্ করে কোনও প্রশ্ন মনে জাগলে

তার জবাবও খুঁজে পাওয়া যায় না। •সাধারণ-জ্ঞানের বইয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী যে কত দরকারী জিনিস তা এদেশের লেখক বা প্রকাশক কেউ ভাবেন না।

ছোটদের মনে অহরহ যে সব প্রশ্ন জাগে, সেগুলির জবাবই একটু বেশী জটিল ; তা হোক না কেন, সেগুলিকেই যতদূর সম্ভব সহজ করে বলবার চেষ্টা করে তাদের কৌতূহলকে তৃপ্ত করা উচিত। 'ওসব বুঝতে পারবে না', বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সেইজন্য আমি এই বইটিতে সেই সব প্রশ্নের জবাবও দিয়েছি, যা অন্য সকলে এড়িয়ে গেছেন। তাই বলে যে আগাগোড়া ঐ প্রশ্নগুলির বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী চুল-চেরা বিচার করে দেখাতে সক্ষম হয়েছি তা নয়। এর কারণ সাধারণ মন যতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারে ততটুকু 'সাধারণ-জ্ঞানে'র সীমা, তার বাইরে গেলে চলবে না। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম বিচারে এই কারণে অনেক সময়ে সাধারণ-জ্ঞানের প্রশ্নের জবাবগুলো কিছু কিছু ভুল বলেও মনে হতে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না। 'সাধারণ-জ্ঞানে' আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ঐটুকুই মূলগত পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকু এদেশের সাধারণ-জ্ঞানের বইগুলিতে নেই বলেই সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে নীরস।

আমার এই বইটিকে দাম এবং প্রশ্নের সংখ্যার হিসাবের বাইরে রেখেই সঙ্কলন করেছি, কারণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন 'সাধারণ-জ্ঞান' বলতে যে জিনিসটি বোঝায়, সেটা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের জবাব জানবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং সেই সেই বয়সে সেই প্রশ্নের যথাযথ সহজ সমাধান পেলে তবেই তাদের মনন-শক্তি বেড়ে চলে।

কাজেই সেই অনুযায়ী 'সাধারণ-জ্ঞানে'রও একটা পাঠক্রম বা Syllabus থাকা উচিত। অন্য সব দেশের স্কুলে 'সাধারণ-জ্ঞানে'র বই অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে না পড়িয়ে নিয়মিত পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়। কোন্ শ্রেণীর ছাত্রদের অন্ততঃ কোন্ কোন্ প্রশ্নের জবাব জানা উচিত তারও একটা

তালিকা রাখা হয়। এই ভাবে তাদের কৌতূহলী মনের রুচি অনুযায়ী মনের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। আমার 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কেও আমি সেই ধরনের পাঠক্রম অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করেছি—একটি বইয়ের ভিতর সব কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে সস্তায় সকলকে সব কিছু দেবার প্রয়াস পাইনি। জানি না সেদিক থেকে এই বইটিকে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সার্থকতা এ দেশের শিক্ষকসমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করবেন কি না।

অন্য দেশের সাধারণ জ্ঞানের বইতে অর্থাৎ যে বইটি যে দেশের ছেলেদের পাঠ্য, সেই দেশ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন ছেলেদের জানা দরকার—সেই সব প্রশ্ন-গুলিকেই সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাঙলা দেশের সাধারণ জ্ঞানের বইতে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে তেমনি বিশেষ বিশেষ দরকারী প্রশ্ন বা তার জবাবের কোন সন্ধানই মেলে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দু-চারখানি বইতে যে দু' একটি প্রশ্ন আছে, তার জবাব খুব সরল ও বিস্তারিত নয়। অথচ জগতের আজেবাজে সব খবরই আছে সেখানে। এটা কি আমাদের জাতীয় শিক্ষার দৈন্য নয়? তাই আমি এদেশের ছোটদের মনের উপযোগী 'সাধারণ-জ্ঞানে'র 'পাঠক্রম' বা 'সিলেবাস' তৈরী করে নিয়ে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে নীচের ভাগ অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করেছি ও প্রত্যেক ভাগেই একটি করে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে প্রশ্নগুলিকে সাজিয়ে দিয়েছি।

প্রথম ভাগে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে:** (১) বাঙলা ও বাঙালী, (২) তুমি ও তোমার শরীর, (৩) জল, হাওয়া, আলো, উত্তাপ, (৪) গাছপালার জগৎ, (৫) জীব-জগৎ, (৬) আকাশের রাজত্বের খবর, (৭) পাতালের রাজত্বের খবর, (৮) পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ভাগে (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে:** (১) ভারতবর্ষ, (২) কোন্ জিনিসটি কি? (৩) কোন্‌টি কবে প্রথম প্রচলন হ'ল? (৪) আবিষ্কারের ইতিহাস, (৫) ইতিহাসের খুঁটিনাটি, (৬) ভূগোলের নতুন প্রশ্ন, (৭) ভাষা ও সাহিত্যে খুঁটিনাটি, (৮) পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন।

তৃতীয় ভাগে (নবম ও দশম শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে :** (১) পৃথিবীর সবসেরা যা কিছু, (২) বিদেশের বিশেষ জ্ঞান, (৩) রাষ্ট্র ও রাজনীতি, (৪) ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (৬) বর্তমানের পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচয়, (৭) বিদেশের সাহিত্য।

এই পাঠক্রম অনুযায়ী সাধারণ-জ্ঞানের বই হিসাবে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে সকলের সামনে উপস্থিত করার প্রস্তাব নিয়ে আমি কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করি—তাঁরা এবিষয়ে আমাকে সমর্থন করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ, সুসাহিত্যিক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এবং রাণীভবানী স্কুলের প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধানশিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আর সর্ব্বোপরি সহযোগিতা করেছেন যাদবপুর কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজির স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক ডক্টর হীরালাল রায়। ডক্টর রায় সানন্দে আমার বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এঁদের সকলের সমবেত সহযোগিতা ছাড়া 'মধুভাণ্ড'কে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কোনও মতেই সম্ভব হত না— কাজেই এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বই সঙ্কলনে আমাকে দেশী ও বিদেশী বহু গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়েছে, কাজেই সেই সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থকারদের কাছেও আমি চিরঋণী রইলাম।

আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো যদি এই বইটি পড়ে আমার ছোট্ট বন্ধুরা খুশি হয়—এবং যদি বইটি এদেশের শিক্ষকসমাজ ও অভিভাবকগণের কাছে বিন্দুমাত্র আদর পায়।

বিনীত—

'মৌমাছি'

প্রথম সংস্করণ

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, কলিকাতা

একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

বিগত তেরোটি বছর ধরে বাংলা ও বাংলার বাইরের শত শত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-বন্ধুদের কাছে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' বাংলা ভাষার সবসেরা সাধারণ জ্ঞানের বই হিসাবে এমনই সমাদৃত হয়ে আসছে যে সরকারী শিক্ষা পর্ষৎ এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় 'সাধারণ-জ্ঞান'কে পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করার ব্যবস্থা না করলেও বাংলা ও বাংলার বাইরের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরা নিজ দায়িত্বে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' বইটির সার্থকতা উপলব্ধি করে বইটির তিনটি খণ্ডকেই যথোপযুক্ত ক্লাশে পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন।

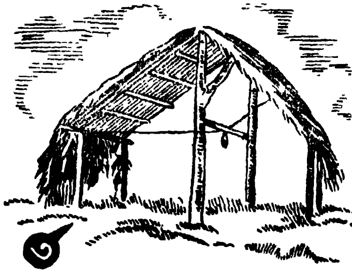
দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের শিক্ষার পদ্ধতি ও মান এই কয় বছরে অনেকখানি বদলিয়ে গেছে, এবং বিশ্বপরিস্থিতির বিবর্ত্তনে ছাত্র-সাধারণের সাধারণ জ্ঞানের নতুন জ্ঞাতব্যও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সে কথা উপলব্ধি করেই, আমি বর্ত্তমান সংস্করণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডের প্রথম ভাগ বইটিকে বাড়িয়ে নতুন কতকগুলি জ্ঞাতব্য ও নতুন অধ্যায় তেমন ভাবেই সংযোগ করেছি, তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলিকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগেই তেমন ভাবে ভাগ করে সাজিয়ে দিয়েছি, যাতে করে আমার এই সর্ব্বজনপ্রিয় বইটি সকলের কাছে প্রিয়তর হয়ে ওঠে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যবিষয়গুলির পরিপূরক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রসারিত করে। একাদশ সংস্করণের এই সংস্কার সম্প্রসারণ কার্য্যে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক, প্রধান-শিক্ষক বন্ধুরা পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সাধারণ-জ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসাবেই আমি তাঁদের অমূল্য পরামর্শ গ্রহণ করেছি এই কারণেই ও তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশে এই বইটির মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বাড়বে বলেই আমি বিশ্বাস করি। 'সাধারণ-জ্ঞান' অনুরাগী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণটির উৎকর্ষটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

কলিকাতা
৩০।৬।৫৪

বিনীত
মৌমাছি







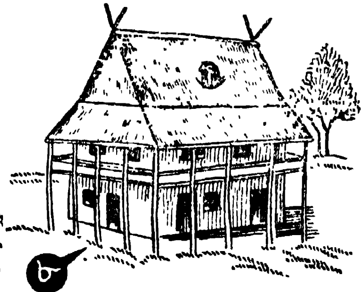


(১) কাম্বোডিয়ার বাড়ি, (২) গুয়াটেমালার চাষীদের বাড়ি, (৩) দক্ষিণ আমেরিকার চালাঘর, (৪) অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের পাতার বাড়ি।



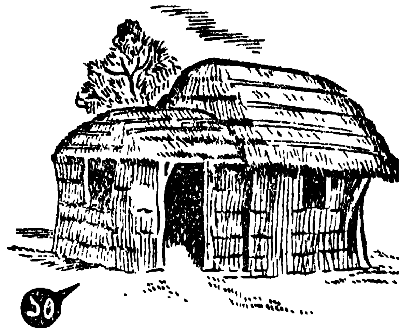


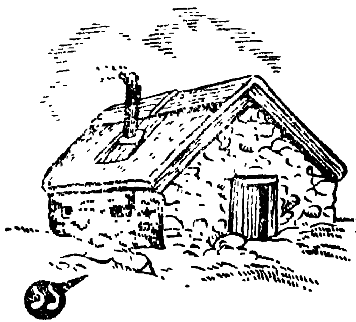




(৫) আসামের নাগাদের ছাউনী কুটির, (৬) সুদানবাসী হাউশাদের ঘাসের কুটির, (৭) ইংলণ্ডের গ্রাম অঞ্চলের খড়ের চাল দেওয়া মাঠকোঠা, (৮) মাদাগাস্কার দ্বীপের বাঁশ ও কাঠের তৈরী বাড়ি; এগুলোকে ওরা "হোভা" বলে।



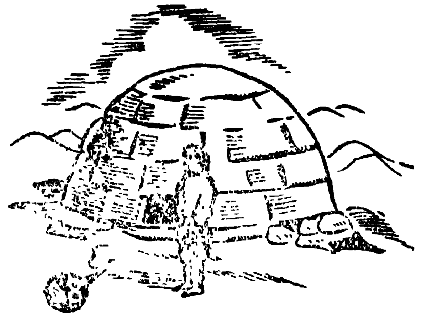


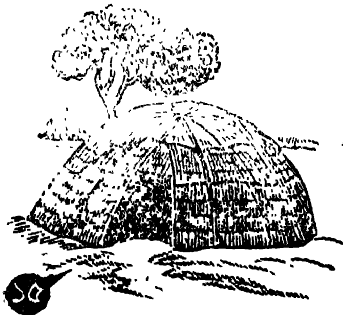


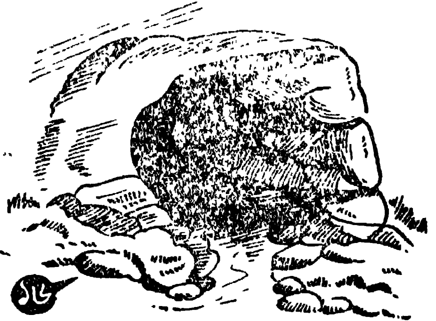


(৯) ইংলণ্ডের প্রাচীন ধরণের পাথরের বাড়ি; ছাদে শ্লেট পাথরের টালি বসানো, (১০) জাপানের আদিম অধিবাসী 'আইনু'দের খড়কুটোর তৈরী চালাঘর, (১১) স্কটল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের পাথরের তৈরী বাড়ি; এগুলোকে সেখানকার লোক 'বোথি' (Bothy) বলে, (১২) লিথুনিয়ার 'লগ হাউস' বাড়ি; এগুলোর দেওয়াল গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে তৈরী হয়, আর চালাটা হয় খড়ের তৈরী।



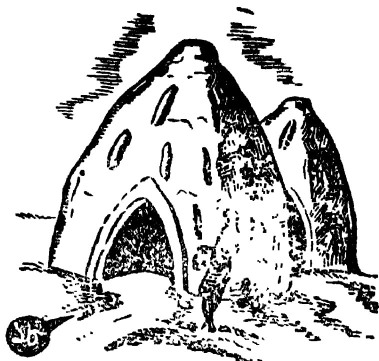


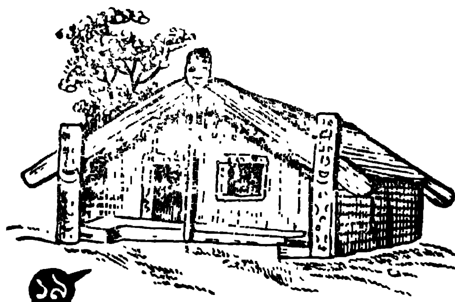




(১৩) ল্যাপল্যাণ্ডের ল্যাপদের ঘাসের চাপড়া গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী আস্তানা, (১৪) এস্কিমোদের তুষার ও বরফের চাঙড় দিয়ে তৈরী গম্বুজা-কারের ঘর—এগুলোকে এস্কিমোরা 'ইগলু' বলে, (১৫) রেডইণ্ডিয়ানদের বেত ও নলখাগড়া দিয়ে তৈরী খুব বড় ধামার মত ঘর ; এগুলি তারা সুবিধা মত উঠিয়ে নিয়ে এখানে সেখানে আস্তানা গাড়ে ; এগুলিকে ওদের ভাষায় বলে 'টেপী' আর 'উইগওয়াল', (১৬) আদিম মানুষের পাহাড়ের গুহা বাড়ি, এখনও অনেক দেশে পাহাড়ীদের মধ্যে অনেকেই এমনি গুহায় বাস করে।

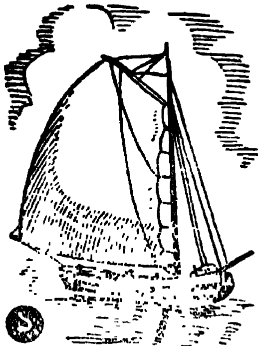


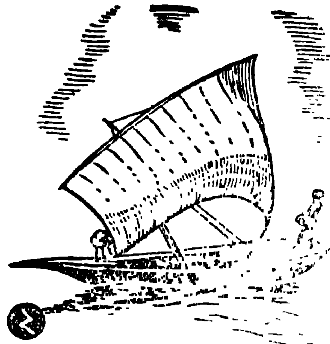


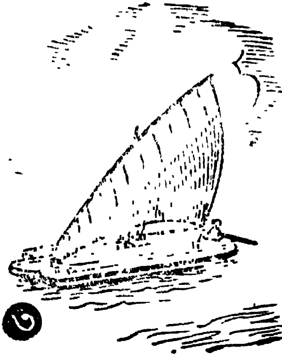


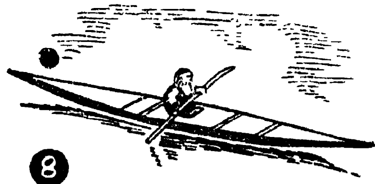


(১৭) বলিভিয়া দেশের কাদামাটি জমিয়ে তৈরী গম্বুজ বাড়ি, (১৮) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবাসী ক্যামেরুণদের কাদামাটি জমিয়ে তৈরী গম্বুজ ঘর, (১৯) মাওরীদের কাঠের তৈরী রঙচঙে নক্সাকাটা বাহারী বাড়ি, (২০) সুমাত্রার কাঠ, বাঁশ ও খড়ের তৈরী জলটুঙী বাড়ি।



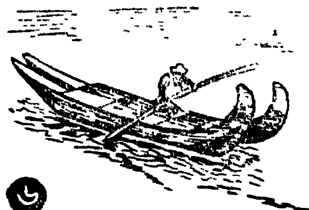


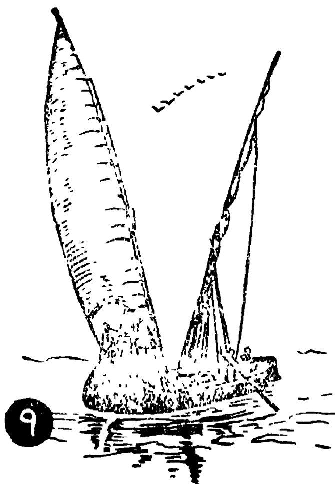


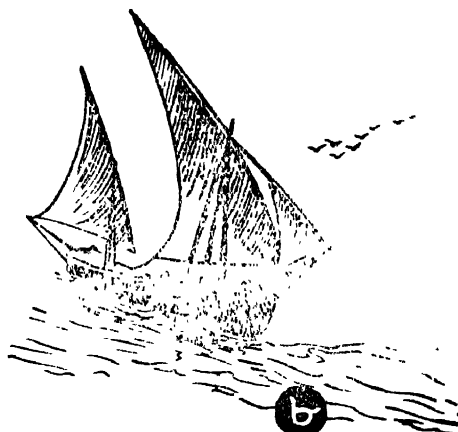


(১) উত্তর সাগর উপকূলের জলাভূমি জুইডার-জী অঞ্চলের নৌকো, এগুলোকে বলে "Zoe-Boat", (২) বোম্বাই ও কচ্ছ উপকূলের 'বোম্বাই ডিঙ্গী' নৌকো, (৩) 'ক্যাটামারন' নৌকো—এই ধরণের নৌকো তিন টুকরো কাঠকে এক সঙ্গে দাড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তৈরী হয়; এই ক্যাটামারন নৌকো সাধারণত দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের সাগরে; পুরী ও মাদ্রাজের সমুদ্রে ঐ ধরণের 'কাঠ বান্ধী' ভেলা চড়েই জেলেরা মাছ ধরে, (৪) এস্কিমোদের নৌকো, নাম—'কায়াক'।

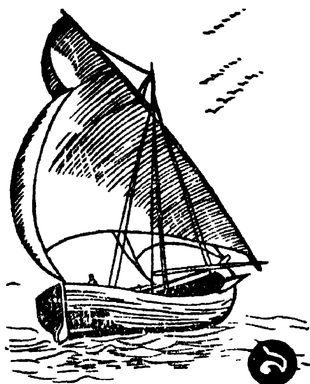


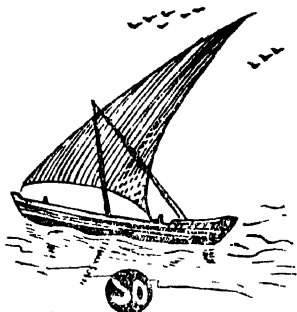




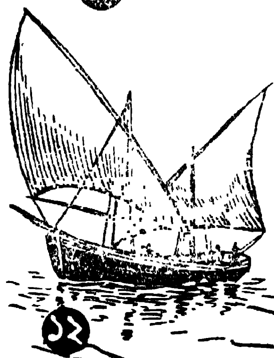


(৫) ক্যানাডায় বার্চ গাছের ছাল সেলাই করে তৈরী 'ক্যানো' নৌকো, (৬) পেরুর 'বাল্সা' নৌকো, বাল্সা গাছের শোলার মত হাল্কা অথচ মজবুত কাঠ থেকে ঐ নৌকো তৈরী হয় বলেই তার ঐ নাম, (৭) মিশরের নৌকো—নীল নদের পরী—এই নৌকোগুলির গড়ন অনেকটা হাঁসের দেহের মত, (৮) স্পেনের নৌকো—'ল্যাটিনীয়ার'।









(৯) ইতালীর 'টার্টান' নৌকো, (১০) এডেনের ডিঙ্গি নৌকো, (১১) মাল্টার আশেপাশে জলপথে দেখা যায় এই তিন পাল লাগানো গোজো (Gozo) নৌকো, (১২) টিউনিশিয়ার নৌকো—চেহারায় গড়নে স্পেনের নৌকোটির সঙ্গে মিল আছে, তাই এই নৌকোগুলিকেও বলা হয় 'ল্যাটিনীয়ার'।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

বাঙলা ও বাঙালী

বাঙলাদেশের নাম 'বঙ্গদেশ' হলো কেন ?

মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়, যে, চন্দ্রবংশে যযাতি বলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলে অসুর বংশে বলি নামে এক মহাপরাক্রমশালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। এই বলি রাজা ছিলেন ভারি ধার্মিক, তাই দীর্ঘতমা গৌতম বলে এক ঋষি তাঁকে বর দেন যে, রাজার স্ত্রী, রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি মহাবীর জন্মগ্রহণ করবে। হয়েও ছিল তাই ; বলি রাজার সেই পাঁচটি ছেলের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। পরে এই পাঁচ ভাইয়ের নামেই ভারতের পাঁচটি জনপদের নাম দেওয়া হয় অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রদেশ। ভারতবর্ষের এখনকার রাষ্ট্রিক বিভাগ অনুযায়ী অঙ্গদেশ বিহারের ভাগলপুর বিভাগে, বঙ্গদেশ বলতে বোঝাতো অখণ্ড বাঙলার ঢাকা বিভাগটি, কলিঙ্গদেশ ছিল উড়িয়্যায়, সুহ্ম দেশ বা রাঢ়দেশ ছিল বর্দ্ধমান বিভাগে, আর পুণ্ড্র দেশ ছিল আগেকার উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী বিভাগে।

বিভিন্ন যুগে বাঙলাদেশ কি ভাবে ভাগ করা ছিল ? সেই বিভাগগুলির নাম কি ছিল ?

মহাভারতের যুগে বাঙলাদেশ ৭টি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে ভাগ করা ছিল ; স্বাধীন রাজ্যগুলির নাম ছিল মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, সুহ্ম,

প্রসুহ্ম, অঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় বঙ্গরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তারপর সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্য আবার উদ্ধার করেন। এই রাজা শশাঙ্কের সময়ে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাঁচভাগে ভাগ করা ছিল। তারপর সেনবংশের প্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেনের সময় বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ), বগড়ী বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা ছিল। মুসলমান শাসনে মোগলযুগে—সুবে বাঙলা—সাতগাঁ, খলিফাতাবাদ, মামুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি ১৮টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। আর আমাদের যুগে বাঙলাদেশকে দুভাগ করে একভাগ হলো পূর্ব্বপাকিস্তান অপরাংশ পশ্চিমবঙ্গ।

বাঙালী জাতি আত্মত্যাগ ও একতা বলে কবে সারা আর্য্যাবর্ত্তে বাঙালীর বিজয় নিশান উড়িয়েছিল ?

বারোশো বছর আগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙলার বড় দুর্দ্দিন এসেছিল। কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজনীতির ফলে বঙ্গদেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে বিদেশী রাজারা বার বার বঙ্গদেশ আক্রমণ ক'রে দেশে অরাজকতার ধ্বংসলীলা চালায়। এই অরাজকতা ও অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখে শেষকালে বাঙালী নায়করা এক হ'য়ে এক সঙ্কল্প করলেন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে তাঁদের মধ্য থেকেই একজনকে দেশের অধিপতি বলে নির্ব্বাচিত করলেন। ইনিই "সর্ব্ব-বিদ্যাবিৎ" দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও 'খণ্ডিতারয়াতি ব্যপ্যটের' পুত্র রাজা গোপাল। সমস্ত নেতারা এঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, তাঁদের নিজের নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে। বাঙালীর এ আত্মত্যাগ ও একতা ব্যর্থ হলো না, দেখতে দেখতে রাজা গোপালদেবের অধীনে বঙ্গদেশ এক শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠল, সুখ এল, বিদেশী শত্রুরা দূরে সরে গেল। রাজা গোপালের পুত্র

ধর্ম্মপাল বঙ্গদেশ থেকে সুদূর সিন্ধু, কান্দাহার ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সারা আর্য্যাবর্ত্তে বাঙালীর বিজয় নিশান উড়ালেন। এরপর কান্যকুব্জে যখন তাঁর দরবার হলো সে দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তী ও গান্ধার প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে বাঙালী রাজা ধর্ম্মপালকে সারা আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ বলে স্বীকার করে নিলেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেব তাঁর পিতার রাজ্য আরও বাড়ান। তিনি কামরূপ (আসাম), গুর্জ্জর (গুজরাট), উৎকলের (উড়িষ্যা) রাজাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন। দেবপালদেবের দু'খানি তাম্রশাসন নালন্দায় ও মুঙ্গেরে পাওয়া গেছে, তা' থেকে জানা যায় যে তাঁর আধিপত্য পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত (হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত) বিস্তৃত ছিল। সে সব গৌরবের কথা আজ বাঙলার ছেলেরা ক'জন স্মরণ করে ?

প্রাচীন বাঙলার অতীত গৌরবের প্রধান নিদর্শন কোথায়? সেগুলি কি ?

পূর্ব্ববাঙলার (পাকিস্তান) অন্তর্গত রাজসাহী জেলার জামালগঞ্জের তিন মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুর গ্রামে সম্প্রতি মাটির স্তূপ খুঁড়ে যে বিশিষ্ট ধর্ম্মায়তনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাই হলো বাঙলার অতীত গৌরবের প্রধান প্রমাণ। এই স্তূপের প্রধান মন্দিরটি গড়ার রীতি ও পরিকল্পনা দেখে পণ্ডিতেরা অবাক হয়ে গিয়েছেন। কারণ ব্রহ্ম, কম্বোজ ও যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিও এই ছাঁচে গড়া। বাঙলা যে পূর্ব্ব এশিয়ায় এককালে সভ্যতা ও প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এসব দেখলেই নাকি বোঝা যায়।

বাঙলা সাল কবে থেকে গণনা আরম্ভ হয় ?

বাঙলা সালের বয়স অনুসারে হিসাব করলে মনে হয় যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর যখন বঙ্গদেশ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের অধীনে শক্তিশালী হয়ে স্বাধীন বলে সব প্রথম গণ্য হয়, তখন থেকেই বাঙলা সাল গণনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আসলে বাঙলা সাল গণনার ইতিহাসটা অন্যরকম—বাঙলা

সন এবং মুসলমান 'হিজরী' সনে কোন প্রভেদ নেই। অর্থাৎ মুসলমানরা এদেশে রাজত্ব করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের 'হিজরী' সনই ক্রমে বাঙলাদেশে চলন হয়—এই 'হিজরী' সন ৬২২ খৃঃ অব্দে মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা পালানোর ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল তা সকলেই জানে। 'হিজরী' সন চান্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হতো বলে ফসলের সময় ঠিক করার ব্যাপারে ও জ্যোতির্বিদদের গণনায় নানারূপ অসুবিধা হতো। এ অসুবিধার কথা সম্রাট্ আকবর বুঝতে পেরে, তাঁর রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সৌর হিসাবে বছর গুণতে আদেশ দেন। অর্থাৎ বাঙলা সনের গোড়ার দিকটা গণনা করা হয়েছে চান্দ্রমতে, এবং পরবর্ত্তীকালে ওটা গণনা করা হচ্ছে সৌর মতে। সেইজন্য বাঙলা সনের হিসাবটা চান্দ্রমতে 'হিজরী' সনের সঙ্গে এখন আর মেলে না। কাজেই সন ১৩৬১ সন বলতে ঠিক ১৩৬১ বছর আগেই সে সনটি আরম্ভ হয়েছে তা ঠিক নয়।

মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য জাতি প্রথম কখন আসে ?

১৪৯৮ সালে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে আসার সোজা রাস্তা আবিষ্কার করেন। তাই পর্ত্তুগীজরা তখন প্রাচ্যের বাণিজ্য একচেটিয়া করে নেবার মতলবে ও ভারতবর্ষে আধিপত্য করবার কল্পনায় ভারতের পথে রওনা হন। কাজেই পর্ত্তুগীজরাই সব প্রথম বাঙলা দেশেও আসেন। বাঙলাদেশে প্রথম পর্ত্তুগীজ হিসাবে চারজনের নাম জানা যায়—পাদরী ফ্রান্সিস্ ফার্ণান্ডিজ, ডোমিনিকো ডি জোসো, মেলাকিওর ফন্‌সেকা ও এন্‌ড্রু বাউয়েস্। সম্রাট্ আকবরের কাছ থেকে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজরা বাঙলার প্রাচীন 'সপ্তগ্রাম' ও 'হুগলী' প্রভৃতি কেন্দ্রে বাণিজ্য করবার অনুমতি পান ও হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ দস্যুদের উৎপাতে তখনই বাঙলার নিজস্ব সামুদ্রিক বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পর্ত্তুগীজদের দেখাদেখি ঐ পথ দিয়ে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীরাও এল এদেশে।

বাঙলাদেশে ইংরেজরা কি ভাবে সর্ব্বপ্রথম আসে ?

ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজরা ভারতের মশলা ও কাপড়-চোপড় বিলাতে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতো ; দু'গুণ দাম দিয়ে চড়া দরে এইসব কিনতে হচ্ছে দেখে ১৫৯০ খৃঃ অব্দে ইংরেজদের টনক নড়ল। তাই তাঁরা ভারতে বাণিজ্য করবার জন্য সত্তর হাজার পাউণ্ড মূলধন নিয়ে একজন গভর্ণর ও কয়েকজন ডিরেক্টরের অধীনে একশো পঁচিশ জন ইংরেজ বণিক মিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম দিয়ে এক কোম্পানী গড়া ঠিক করলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এই কোম্পানীর সূত্রপাত হ'ল। রাণী এলিজাবেথ তাঁদের সনন্দ বা হুকুমনামা দিলেন। এরপরেই ১৬০৩ খৃঃ অব্দে জন মিডেল হল বলে এক ইংরেজ কতকগুলি বিলাতী মণিরত্ন আর সুন্দর সুন্দর ঘোড়া উপহার নিয়ে ভারতের সম্রাট্ আকবরের দরবারে হাজির হলেন। কিন্তু তিনি পর্ত্তুগীজ পাদরীদের চক্রান্তে সম্রাট্ আকবরের দরবারে হাজির হয়েও বড় বেশী সুবিধা করতে পারলেন না। এর পর ১৬০৯ খৃঃ অব্দে এলেন হকিন্স সাহেব, তিনি ফারসী ভাষা জানতেন এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে দেবার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মেলাই মনিরত্ন উপহার। আড়াই বছর ধরে তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মন জুগিয়ে তোষামোদ করে, শেষে অনেক কষ্টে সুরাটে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। এরপর ১৬১৫ খৃঃ অব্দে এলেন স্যার টমাস রো, তিনিও নানা উপহার সঙ্গে এনেছিলেন। এই সব উপহার দিয়ে দিল্লীর দরবার থেকে ১৬২০ খৃঃ অব্দে আগ্রায় ও ১৬২৩ খৃঃ অব্দে পাটনায় কুঠি খুলবার অনুমতি পান। এ ছাড়া শোনা যায় ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে ইংরেজ ডাক্তার ব্রাউটন সম্রাট্ শাজাহানের মেয়ে ও বাঙলার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজার বেগমের অসুখ সারিয়ে দিয়েই বিনা শুল্কে বাঙলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি পান। এরপর ১৬৪২ খৃঃ অব্দে হুগলীতে ও ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে কাশিমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করে সোরা ও রেশমের ব্যবসাতে কোম্পানী অনেক লাভ করে।

এইভাবে ব্যবসা করার ছুতায় ইংরেজরা প্রথম বাঙলাদেশে তাদের আস্তানা গাড়ে।

বাঙলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত কে করে এবং কবে?

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মীরজাফর নবাব হন, এই মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাট্ শাহ আলামের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পান এবং বাঙলার নবাব নজমুউদ্দৌলার কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে বাঙলার স্থবেদারী পান। এর পরের বছরই লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে দরবার করে নবাবের পাশে দেওয়ান হয়ে ব'সে প্রথম পুণ্যাহ উৎসব করেন। এর কিছুদিন পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নজম্উদ্দৌলা হঠাৎ মারা যান এবং তাঁর ১৬ বছরের ভাই সৈফ উদ্দৌলা নায়েব নাজিম হন। এই সময়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বিলাতের পার্লামেণ্ট সভার একটা বোঝা-পড়া শুরু হয় এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দেই সাব্যস্ত হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে যে দেওযানী পেয়েছে তা ইংলণ্ডের রাজার প্রাপ্য। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সর্ত্ত হয় যে তাঁরা পার্লামেণ্টকে বছরে চার লক্ষ পাউণ্ড কর দেবেন এবং তাছাড়া আরও চার লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী পণ্য কিনে এনে ভারতবর্ষে বেচবেন। এর পরেই ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতায় ফিরলেন। এই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ই ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্টের প্রভুত্বটাও কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বাঙ্গলা তথা ভারতের বুকে ভালো ভাবেই দেখা দিল। তিনিই বাঙালার ও বিহারের নায়েব নাজিমদের বরখাস্ত করে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী বা কালেক্টর নিযুক্ত করলেন। কলিকাতায় এক রেভিনিউ বোর্ড খাড়া করে রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় সরিয়ে আনলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে কাউন্সিল গড়ে ইংরেজী শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত

করলেন, তখনই ব্যবসা বাণিজ্য থেকে বাংলাদেশে ইংরেজদের দেওয়ানী রাজ্যপাট গড়ে উঠল। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর শাসন এদেশে চালু ছিল।

বাঙলাভাষা কোথা থেকে ও কেমন করে এল ?

বাঙলা ভাষার জন্ম নিয়ে যে সব ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা আন্দাজ করে বলেন যে ২০০ খৃষ্টাব্দে এদেশে ইণ্ডো-এরিয়ান-ভাষার শাখার প্রাকৃত-ভাষার চল ছিল, সেই ভাষা থেকেই এসেছে বাঙলাভাষা, কিন্তু এই ভাষার মূল হল সংস্কৃত। তারপর ৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'মাগধী'-অপভ্রংশের রূপ নেয় এবং সেটাই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন বাঙলায় রূপান্তরিত হয়। পরে প্রাকৃত, মৈথিলী, ফারসী, উর্দ্দু, পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার বহু শব্দ বাঙলাভাষার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার তুলনায় বাঙলাভাষার সাহিত্যই বর্ত্তমানে সবচেয়ে উন্নত—তাছাড়া বাঙলাভাষা হল ছয়কোটি লোকের মাতৃভাষা। অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে এত লোক মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে না। তবে বর্ত্তমানে বাঙলাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ভারতের অংশ পড়েছে মাত্র দু'কোটি বাঙলা ভাষা-ভাষী লোক। বাঙলাভাষা বলতে যা আমরা বর্ত্তমানে সবাই বুঝি, এর বয়স আন্দাজ সাড়ে ছ'শো বছর, তার আগেকার বাঙলাভাষা বলতে যা পাওয়া যায়, তা নাকি বর্ত্তমানের বাঙালীরা বুঝতে পারে না।

বাঙালাভাষায় আদি কাব্য কি ? আদি কবি কে ?

বাঙলাভাষায় কৃত্তিবাসকেই 'আদি কবি' বলা হয়, কারণ পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন কৃত্তিবাস রচিত 'ভাষা রামায়ণই' বাঙলাভাষার আদি কাব্য, তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে যথেষ্ট। এই কৃত্তিবাস কবির পুরো নাম 'কৃত্তিবাস ওঝা', ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন কলিকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম ছাপা বই কি?

বাঙলা অক্ষরে সব প্রথম যে বই ছাপা হয়, সেটি একটি বাঙলা ব্যাকরণ। এটি রচনা করেন মিঃ হ্যাল্‌হেড্‌ বলে একজন ইংরেজ—সেটা ছাপা হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। এই হ্যাল্‌হেড্‌ সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সব প্রথম বাঙলাভাষায় পণ্ডিত হয়েছিলেন। এর আগে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা লিস্‌বন শহরে ইংরেজ অক্ষরে বাঙলাভাষায় একটা বই ছেপেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাঙলাভাষায় গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস কি?

খুব প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের গদ্য অচল ছিল। তখন সব কিছু কাব্যের আকারেই লেখা হত; কিন্তু সেকালের চিঠি ও দলিলপত্রে এক ধরণের গদ্য প্রচলিত ছিল। বইয়ের আকারে আজ পর্য্যন্ত যে-সব প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনিই মৌলিক গদ্যের প্রথম সৃষ্টি করেন এদেশে—এই গ্রন্থ রচনা ক'রে। পর্ত্তুগীজ পাদরী 'ফ্রে ম্যানুয়েল দ্য আসাম্পো'র লেখা কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের একখানি উল্লেখযোগ্য বই। তারপর বাঙলা-গদ্য রাজা রামমোহনের হাতে নতুন উৎকর্ষ লাভ করে। এবং পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী বাঙলাভাষাকে গদ্য আকারে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা সাধু ভাষায় রচিত গদ্য-সাহিত্য খুবই উন্নত হয়।

বাঙলাদেশে প্রথম থিয়েটার বা প্রমোদাগার কবে তৈরী হয়?

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হওয়ায়, তারাই কলিকাতায় আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা করে প্রথমে ইংরেজী ধরণের থিয়েটার তৈরী করে।

বাঙলাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোথায় হয় ?

বাঙলাদেশে সব প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে ; পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইল্‌কিন্স সাহেব এই কাজটি করেন। এখান থেকেই হ্যাল্‌হেড সাহেবের 'বাঙলা ব্যাকরণ' ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

বাঙলাভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা কি ?

বাঙলাভাষায় উল্লেখযোগ্য প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বাঙলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙলাদেশে গোল টাকা ও তামার পয়সার প্রচলন কবে হয় ?

বাঙলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বকালে চারচৌকা খাঁটি রূপার মুদ্রা চলতি ছিল এবং সেই মুদ্রাই ব্যবসা বাণিজ্যে ওজন ও মাপের মান ছিল। পাশাপাশি চব্বিশটি মুদ্রা রাখলে মাপ হতো একহাত ও একশো মুদ্রা এক-সঙ্গে করলে যে ওজন হতো তাই হতো, একসের। এই সব মুদ্রাতেও রাজাদের নাম লেখা থাকতো। মোগল রাজত্বের সময় সব প্রথম গোল চেহারার টাকার প্রচলন হয়, ও তুরাণী ভাষার 'তঙ্কা' শব্দ থেকেই 'টাকা' কথাটির উৎপত্তি। তখন এদেশে সিকি, দুয়ানি, আনি বা আধুলি প্রভৃতি মুদ্রা ছিল না। টাকা ভাঙিয়ে নিতে হতো কড়ি, কিন্তু এক টাকার কড়ি, বয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল এক মুস্কিলের ব্যাপার। তাই টাকা ভাঙিয়ে তামার পয়সা 'ঢেপুয়া' দেওয়া প্রচলন করেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। এক টাকার বদলে ১৬ গণ্ডা বা ৬৪টি 'ঢেপুয়া' পাওয়া যেতো এবং এক 'ঢেপুয়া'র বদলে পাওয়া যেতো ২০ গণ্ডা কড়ি।

ইংরেজরা এদেশে কবে প্রথম টাকা তৈরী করে ?

ইংরেজরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতার টাকশালে 'আলিনগর' নামাঙ্কিত টাকা তৈরী করে।

বাঙলাদেশে কাগজের মুদ্রা বা নোটের প্রচলন প্রথম হয় কবে?

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সই করা পঞ্চাশ, একশো ও পাঁচশো টাকার ও এক মোহর দামের নোট সাধারণের কাছে চালু করা হয়।

বাঙলাদেশে পয়সার বদলে আনির প্রচলন হলো কবে?

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর তামার পয়সার বদলে চারটি পয়সা এক ক'রে 'আনি' বলে এক নতুন ধরণের মুদ্রা চলতি হয়। কিন্তু এই আনি তৈরীর প্রস্তাব প্রথমে করেন ইঞ্জিনিয়ার রোইয়ার সাহেব ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে।

বাঙলাদেশে সব প্রথম ডাকঘরের ডাকটিকিটের সৃষ্টি হয় কবে?

সম্রাট্ 'শেরশাহ'ই সব প্রথমে এদেশে ডাকঘরের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তখন এখনকার মত টিকিট দিয়ে মাশুল আদায় করবার ব্যবস্থা ছিল না, দূরত্ব অনুসারে ডাক মাশুলের হার কম-বেশী হতো। রাজা ও জমিদারের চিঠিগুলিই কেবল ঠিকানামত বিলি করার ব্যবস্থা ছিল, অন্যান্য লোককে মাশুল দিয়ে ডাকঘর থেকে চিঠি নিয়ে আসতে হতো। তখন সমস্ত শহর ও সদর কশ্‌বাতে ডাকঘর ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম ডাকটিকিট তামার চাক্‌তিতে ছাপা হয়। তারপর ১৮৩৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু করেন তখন সিন্ধু প্রদেশের কমিশনার বাটলি ফ্রিয়ার কাগজের ডাকটিকিটের মতলব দেন। কর্ণেল কোর্বস্ কলকাতার টাঁকশালে এই ডাকটিকিটের প্রথম নক্সা করেন।

বাঙলাদেশে রেলপথ ও ষ্টীমারপথ কবে থেকে শুরু হয়?

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, কাজেই প্রাচীনকালে বাঙলাদেশে জলপথেই যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য বেশীর ভাগ চলতো; তবে ষ্টীমারের চল তখনও হয়নি, বজরা, নৌকো, ছিপ, ডিঙি, এই সব নানারকমের জলযান তখন এদেশে ছিল। ষ্টীমারপথ খোলা হয় সবপ্রথম ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা আর গৌহাটীর মধ্যে এই ষ্টীমারপথ খোলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের

১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া থেকে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খোলেন। বাঙলাদেশে এই প্রথম রেলপথ।

বাঙলাদেশে প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ কবে দেখা যায়?

প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ আসে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, তার নাম 'এণ্টারপ্রাইজ'।

বাঙলাদেশে কবে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হয়?

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার অবধি যে টেলিগ্রাফ লাইনের ব্যবস্থা হয় সেটাই সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা।

বাঙলাদেশে প্রথম কবে, কোথায় টেলিফোন ব্যবস্থা চলু হয়?

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙলাদেশে—কলিকাতা সহরে সব প্রথম টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা হয়, তখন মাত্র ৫০ জন ধনী লোক এই যন্ত্রের গ্রাহক ছিল।

বাঙলাদেশে প্রথম ট্রাম গাড়ী চলে কবে থেকে?

সব প্রথম ট্রামলাইন খোলা হয় কলিকাতার চৌরঙ্গী, চিৎপুর আর শিয়ালদহ অঞ্চলে। সেটা হল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মধ্য-কলিকাতার বাঁধানো রাস্তায় রাস্তায় ট্রাম লাইন ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তখনকার সেই ট্রাম গাড়ী এখনকার মত বিদ্যুতের সাহায্যে চলতো না। অষ্ট্রেলিয়া দেশ থেকে বড় বড় ঘোড়া আনিয়ে এই ট্রাম গাড়ী টানানো হতো। কিন্তু ঘোড়াগুলো গরমে পটাপট মরছে দেখে চেষ্টা হলো বাষ্পচালিত ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালাবার, তাও তখন সুবিধে হলো না। শেষকালে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা হল কলিকাতার রাস্তায়। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা ভাল চলল দেখে ট্রাম-কোম্পানী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতার দিকে দিকে ট্রাম গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন।

বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহার ও বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদ সব প্রথম শুরু করেন কে?

বাঙালী হিন্দুরাই সব প্রথম পাদরী ও ইংরেজ ভদ্রলোকদের সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কারণ তখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা

বা ইউরোপের ভাবধারা সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার জন্য কোম্পানীর লোকদের কোনও আগ্রহই ছিল না। যাই হোক বাঙালী হিন্দু যুবকেরা ইংরেজী ভাষা শিখে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ খুঁজে পেলেন, এবং তখন থেকেই তাঁরা ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহার ও বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আরম্ভ করলেন। বাঙলার যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলো তখন থেকেই, এবং সেই রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ই সবপ্রথম উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি সে-যুগে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার খুব তীব্র সমালোচনা করেন, এমন কি তিনি বিলাতে গিয়েও কোম্পানীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কি?

বাঙলাভাষায় প্রথম যে সংবাদপত্রটি ছাপা হয়, যতদূর জানা যায় নাম তার 'সমাচার দর্পণ'। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ বলেন 'বেঙ্গলী গেজেট' এর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বাঙলা সাহিত্যের স্থান কোথায়?

বাঙলা সাহিত্য ভারতের বর্ত্তমান সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বসাহিত্যেও বাঙলা সাহিত্যের স্থান অন্যান্য দেশের সাহিত্যের অনেক উপরে।

বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করেন কে?

বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করেন সবপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাঙলা সাহিত্যে সব চেয়ে বেশী দাম কার? বর্ত্তমান যুগকে বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন?

বাঙলা সাহিত্য সবচেয়ে বেশী রকমের ও সংখ্যাতেও সবচেয়ে বেশী বই লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক,

দর্শনতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু বই লিখেছেন। এ ছাড়া, শিশুদের জন্যও অনেক মজার মজার বই লিখেছেন। বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ হল 'রবীন্দ্রনাথের যুগ', কারণ রবীন্দ্রনাথই তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কার দ্বারা বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত হন। বাঙলা সাহিত্যকে তিনিই বিশ্বসাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম উপন্যাস কি ?

টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' বলে যে উপন্যাসটি লেখেন সেটি বাঙলাভাষায় প্রথম মৌলিক উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর বলে কোন লোকই ছিল না, আসলে ওটি হল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'ছদ্মনাম'।

বাঙলায় সবপ্রথম জাতীয়-সঙ্গীত কোন্‌টি ?

বাঙলাদেশের বর্ণনা দিয়ে বঙ্গজননীর বন্দনায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্‌' বলে যে সুন্দর গানটি রচনা করেন, সেটিকেই সব প্রথম ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিই জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়। "বন্দেমাতরম্‌"ও অবশ্য জাতীয়-সঙ্গীতের মর্য্যাদা পেয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার কে ?

অনেকে রামনারায়ণ তর্করত্নকেই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার আখ্যা দেন, কারণ তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধরণে সব প্রথমে বাঙলাভাষায় নাটক লেখেন—তাঁর প্রথম নাটক, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, তার বহু আগেই নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী', 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুক-সর্ব্বস্ব', তারাচাঁদ সিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু'-নাটক প্রভৃতি নাটকের চল ছিল। তবে সেগুলি বিয়োগান্ত নাটক সুতরাং এদেশের রীতিবিরোধী ব'লেই বাঙলা সাহিত্যে গৃহীত হয়নি।

থিয়েটারে বাঙলা নাটকের অভিনয় প্রথম কবে হয় ?

প্রথম বাঙলা-নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে—হেরাশিম লেবেডফ (Herassim Lebedoff) নামে একজন রুশ দেশের লোক এক নাট্যসমিতি খোলেন, সেখানেই Disguise ও Love is the best doctor বলে দু'খানি ইংরেজী নাটকের বাঙলা অনুবাদ-নাটক অভিনীত হয়। এই হলো থিয়েটারে বাঙলা নাটকের প্রথম অভিনয়।

বাঙলাভাষার প্রথম শিশু-মাসিক-পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয় ?

যতদূর জানা যায় প্রথম বাঙলা শিশু-মাসিক-পত্র 'সখা' প্রকাশিত হয় বাঙলা ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে, প্রকাশ করেন প্রমদাচরণ সেন।

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন কবে হয় এবং কে করেন ?

জানা যায় যে তাহিরপুরের জমিদার বংশের রাজা কংসনারায়ণই পণ্ডিতদের ব্যবস্থা অনুযায়ী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম এদেশে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন। পণ্ডিতরা পুরাণ পুঁথি ঘেঁটেই এ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে ছোটদের উপযোগী লেখা লিখে কে কে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ?

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার রায়-চৌধুরী, নিশিকান্ত সেন, সুখলতা রাও, সুনির্ম্মল বসু, সবিনয় রায়চৌধুরী, প্রভৃতি।

বাঙলার প্রধান নগরী কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস কি ?

কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। আড়াইশো বছর আগে এই কলিকাতা শহর একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর উন্নতি হয়। কিন্তু 'কলিকাতা' নামের সব প্রথম

উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে লেখা বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পাতায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা রাজা টোডরমল্লের খাজনা আদায়ের খাতাতেও 'মহাল কলিকাতা' ব'লে উল্লেখ আছে।

এখন খাস কলিকাতা বলতে যে জায়গাটি বোঝায়, আগে ঐখানে সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি বিভিন্ন গ্রাম ছিল। কলিকাতায় ও সূতানুটিতে ইংরেজ আমলের আগে তাঁতের কাপড়ের সূতা বিক্রয় করার জন্য একটি বড় হাট ছিল। এই সূতানুটিতেই ১৬৯০ খৃঃ অব্দে ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক প্রথমে আসেন এবং তখনই সূতানুটিতে ইংরেজরা কুঠি তৈরী করে ব্যবসা শুরু করার মতলব করেন। মহানগরী কলিকাতার পত্তন বাস্তবিক পক্ষে সেইদিন থেকেই শুরু হয়।

বাঙলাদেশের প্রথম লাইব্রেরী কোনটি ?

বাঙলাদেশে জনসাধারণের জন্য আধুনিক কালে প্রথম যে লাইব্রেরী হয়, তার নাম হচ্ছে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী', এটা স্থাপিত হয় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে—'মেট্‌কাফ হল' বলে একটি বাড়ীতে, পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সেটা গভর্ণমেন্টের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে এক হয়ে যায় ; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই লাইব্রেরীটিই ভারতের জাতীয় পাঠাগার বা ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়। আলিপুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বাঙলাদেশে কবে প্রথম পাথরের বাঁধানো রাস্তা তৈরী হয় ?

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে সব প্রথম—পাথর বাঁধানো রাস্তা তৈরী হয়।

বাঙলাদেশে কবে সব প্রথম ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলে ?

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ মে কলকাতায় সব প্রথম ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে।

বাঙলাদেশে কোথায় কবে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ?

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। এ খেলাটা হয়েছিল 'ইটোনিয়ান সিভিল সার্ভেণ্টস' আর এখানকার বাছাই-করা সাহেবদের একটা দলের মধ্যে। ভারতেও এই প্রথম।

বাঙলাদেশে ফুটবল খেলার ইতিহাস কি ?

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সব প্রথম গড়ের মাঠে ইংরেজ সৈন্যরা ফুটবল খেলার আমদানী করে। তাঁদের খেলা দেখে হেয়ার স্কুলের একটি ছাত্র, নাম নগেন্দ্র-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, তার মাথায় ঢুকল ঐ রকম একটা দল গড়ে ফুটবল খেলা শেখা। নগেন্দ্রপ্রসাদ হেয়ার স্কুলের ছেলেদের নিয়ে দল গড়ে ফুটবল খেলা শুরু করলেন—পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক Mr. Stack আর Mr. Gilligan এর চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও ফুটবল খেলার দল গড়লো। এদের দেখাদেখি সেণ্ট জেভিয়ার্স ও হিন্দু-স্কুলের ছেলেরা, এদের দলে এসে যোগ দিয়ে, ভারতের প্রথম সম্মিলিত ফুটবল দল গড়লো।

বাঙলাদেশে ঘোড়দৌড় খেলা কবে আরম্ভ হয় ?

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এদেশের ধনীদের নতুন জুয়ায় প্রবুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বেঙ্গল জকী ক্লাবের সাহেবদের চেষ্টায় এদেশে ঘোড়দৌড় খেলা আরম্ভ হয়। তখন কলিকাতার কিছু দূরে আকনায় ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমানের ঘোড়দৌড়ের মাঠ—ক্যালকাটা রেসকোর্স তৈরী হয়।

বাঙলাদেশের মানচিত্র সব প্রথম কবে আঁকা হয় ?

সব প্রথম ভারতবর্ষের 'ম্যাপ' আঁকেন ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী ভূগোলবিৎ, তার নাম 'ডি এ্যান্‌ভিল'। বাঙলাদেশের ম্যাপ প্রথম আঁকা হয় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। যিনি এই ম্যাপ আঁকেন—তাঁর নাম মেজর জেমস্ রেণেল—ইনি লর্ড ক্লাইভের অধীনে চাকরী করতেন। ইনি ভারতীয় ভূগোলের স্রষ্টাকর্ত্তা।

বাঙলাদেশে বিলাতী ধরণের বাজার প্রথম কবে খোলা হয় ?

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী স্যার স্টুয়ার্ট হগ্ মার্কেট নামে যে বাজারটি খোলা হয় সেটিই এ দেশের সবপ্রথম বিলাতী ধরণের বাজার। বর্ত্তমানেও এইটি আছে।

বাঙলাদেশে প্রথম কলকারখানা কি ভাবে গড়ে ওঠে ?

শ্রীরামপুরে ডাঃ কেরী সব প্রথম ছোটখাটো ধরণের কাগজ তৈরীর

কারখানা খোলেন। সেটিই প্রথম কারখানা। তারপর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ অকল্যাণ্ড রিষড়াতে প্রথম পাটকল খোলেন।

বাঙালীর গৌরবে ভারতবর্ষ গরীয়ান কেন?

ভারতীয় সমস্ত জাতির মধ্যে বাঙালীরা সকল বিষয়ে সব সময়েই অগ্রণী, তাই বাঙালীর গৌরবে ভারতবর্ষ গরীয়ান। যেমন বলতে পার--

(১) বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ পান।

(২) বাঙালী রামমোহন রায় বিশিষ্ট ভারতবাসীদের মধ্যে সবপ্রথম বিলাত যান।

(৩) বাঙালী সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতবাসীদের মধ্যে সবপ্রথম গভর্ণর ও বিলাতের লর্ডস্ সভার সভ্য হন।

(৪) বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন।

(৫) পশ্চিম বাঙলা রাজ্যের দার্জ্জিলিং জেলার অধিবাসী তেনজিং নোরকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সবপ্রথম এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করে জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপনা করেন।

(৬) বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন।

(৭) বাঙালী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম I. C. S. হন।

(৮) বাঙালী চিত্তরঞ্জন দাস ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম মেয়র সম্মান লাভ করেন।

(৯) বাঙালী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের সম্মান লাভ করেন।

(১০) বাঙালী দিগম্বর মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম শেরিফের সম্মান লাভ করেন।

(১১) বাঙালী স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মান লাভ করেন।

(১২) বাঙালী নীলমণি মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ইঞ্জিনীয়ার হন।

(১৩) বাঙালী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখেন।

(১৪) বাঙালী স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম এড্‌ভোকেট জেনারেল হন।

(১৫) বাঙালীর মেয়ে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি-এ ও চন্দ্রমুখী বসু এম-এ, এই দু'জনেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলীই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন।

(১৬) বাঙালীর মেয়ে চন্দ্রলেখা বসু ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম বিলাতে যান।

(১৭) বাঙালীর মেয়ে তরু দত্ত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কবিতা লেখেন।

(১৮) বাঙালীর মেয়ে প্রভাবতী দাশগুপ্তা ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সবপ্রথম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি এইচ-ডি' উপাধি লাভ করেন।

(১৯) বাঙালী উদয়শঙ্কর ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয়-নৃত্য দেখিয়ে দেশবিদেশে সম্মান লাভ করেন।

(২০) বাঙালী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রকে জগতের সমক্ষে তুলে ধরেন।

(২১) বাঙালী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম ভারতীয় যিনি জগতে প্রমাণ করেন যে গাছপালা এদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

(২২) বাঙালী কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার হন।

(২৩) বাঙালী আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন।

(২৪) বাঙালী হরিনাথ দে ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রকম ভাষা জানতেন।

(২৫) বাঙালী রমাপ্রসাদ রায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হাইকোর্টের জজ হন।

(২৬) বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম সংবাদিক।

(২৭) বাঙালী দুর্গাচরণ লাহা ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পোর্ট কমিশনারের সভ্য হন।

(২৮) বাঙালী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয়দের নিয়ে সবপ্রথম সুসংগঠিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বা 'স্বাধীন ভারত বাহিনী' গড়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেন ও মণিপুর সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হন।

(২৯) বাঙালীর মেয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে ভারতের প্রথম মেয়ে শহিদ।

(৩০) বাঙালীর ছেলে সুব্রত মুখার্জ্জী প্রথম ভারতীয় যিনি বিমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়করূপে কাজ করেন।

(৩১) বাঙালী শিল্পী রণদা উকীল, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মন, সুধাংশু রায় চৌধুরী ও ললিতমোহন সেন ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউস' চিত্রিত করবার সম্মান লাভ করেন।

কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বাঙালী স্বনামধন্য হয়েছেন ?

(১) **সাহিত্যে**—কৃত্তিবাস ওঝা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম, রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চন্দ্রাবতী,

রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোকুল নাগ, 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু), প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, রজনীকান্ত সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমদরঞ্জন মল্লিক, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, কামিনী রায়, অনুরূপা দেবী, রাধারাণী দেবী, মোজাম্মেল হক, মীর মশাররফ হোসেন, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মৌলভী রেজাউল করিম, প্রমথনাথ বিশী।

(২) **বিজ্ঞানে**—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিরজাশঙ্কর গুহ, শিশিরকুমার মিত্র, দেবেন্দ্রমোহন বসু।

(৩) **ইতিহাসে**—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ননীগোপাল মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ চন্দ, রামপ্রাণ গুপ্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, নীহাররঞ্জন রায়।

(৪) **শিল্প-কলায়**—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুলচন্দ্র দে, সারদা উকীল, অসিতকুমার হালদার, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

(৫) **সঙ্গীত-কলায়**—রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধিবাবু), গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অতুল-প্রসাদ সেন, লালচাঁদ বড়াল, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, দিলীপকুমার রায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্ম্মন, সাহানা দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, উত্তরা দেবী, শৈল দেবী, গীতা রায়।

(৬) **জাতীয়-আন্দোলনে**—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, লালমোহন ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরলা দেবী, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকা মজুমদার, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ শাসমল, হরদয়াল নাগ, সরোজিনী দেবী (নাইডু), আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, আবদুল শোভান চৌধুরী, খাজা আতিকুল্লা, রাসবিহারী বসু, যতীন মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যতীন দাস, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(৭) **ব্যবসা-বাণিজ্যে**—রামদুলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ পাল, কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, আলামোহন দাস।

(৮) **চিকিৎসা-বিদ্যায়**—গঙ্গাধর সেন, দ্বারকানাথ সেন, গুডিভ চক্রবর্ত্তী, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল দত্ত, সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কেদারনাথ দাস, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, গণনাথ সেন, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কুমুদশঙ্কর রায়।

(৯) **ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে**—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী প্রণবানন্দ।

(১০) **শিক্ষা-প্রসারে**—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহম্মদ মহসীন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব্বকুমার চন্দ।

(১১) **নারীমুক্তি আন্দোলন ও স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে**—মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভামিনী দাস, কালীকৃষ্ণ দেব, অবলা বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুসদয় দত্ত, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরলা দেবীচৌধুরাণী, সরলাবালা সরকার, সারদেশ্বরী দেবী।

(১২) **ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে**—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দীনেশচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ক্ষিতিমোহন সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বসন্তরঞ্জন রায়, গোপীনাথ কবিরাজ, যোগেশচন্দ্র রায়।

(১৩) **সাংবাদিকতায়**—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামমোহন রায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণদাস

পাল, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীনাথ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার, হেমচন্দ্র নাগ, সজনীকান্ত দাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(১৪) **আইন ব্যবসায়ে**—রাসবিহারী ঘোষ, আবদার রহিম, তারকনাথ পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ, সৈয়দ আমির আলি, রমেশচন্দ্র মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ দে, রাধাবিনোদ পাল, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১৫) **খেলাধুলায়**—সারদারঞ্জন রায়, উমেশচন্দ্র মজুমদার, (দুখীরামবাবু), এস্ ব্যানার্জ্জী (ক্রিকেট)। শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ী, অভিলাষ ঘোষ, গোষ্ঠ পাল, মনা দত্ত, সামাদ, আব্বাস (ফুটবল)। প্রফুল্লকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সাঁতার)। শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশানন্দ ঢেঁকী, যতীন্দ্রমোহন গুহ (গোবরবাবু), কাপ্তেন পি. কে. গুপ্ত (শক্তি চর্চ্চা)। বিষ্ণু ঘোষ (ব্যায়াম)। এস. কে. মুখার্জ্জী, দিলীপ বসু (টেনিস)। অমর দত্ত (ভার তোলা)। প্রত্যূষ দেব (বিলিয়ার্ড খেলা)। পরেশলাল রায়, বলাই-দাস চট্টোপাধ্যায়, জগৎকান্ত শীল (মুষ্টিযুদ্ধ)। মনোতোষ রায় (বিশ্বশ্রী)।

(১৬) **দানব্রতে**—মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, রাণী কাত্যায়নী, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, রাজেন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ-লাল রায়, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শশিভূষণ দে, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

(১৭) **নাটক অভিনয়ে**—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

বাঙালী কি 'যুদ্ধ-অপারগ' জাতি ?

না! সে কথা সত্য নয়, তোমরা যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়ো, জানতে পারবে যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যখন আর্য্যরা সভ্যতা বিস্তার ক'রে বিভিন্ন রাষ্ট্র জড় ক'রে দিকে দিকে এগিয়ে চলেছিল, তখন তারা সব প্রথম বাধা পায় বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে। আর্য্যদের কাছে তাঁরা মাথা নোয়াননি প্রথমে। তারপরে যখন মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সারা আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্যবিস্তার করেন, তিনিও প্রাচীন বাঙলার 'গঙ্গারিড়ি' বা 'গঙ্গারাঢ়' রাষ্ট্রকে বড় সহজে পদানত করতে পারেননি। তারপর বাঙলা দেশ যখন গৌড়বঙ্গ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে—তখন গৌড়েশ্বর, মুসলমান রাজা সামসুদ্দীন ইলিয়াসের সঙ্গে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ সাহ তোগলকের ভয়ানক যুদ্ধ বাধে—এই যুদ্ধ 'একডালার যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে সহদেব নামে একজন বাঙালী সেনাপতি একলক্ষ আশি হাজার বাঙালী সৈন্য নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। বাঙালীর বীরত্বেই সেবার ফিরোজ শাহ তোগলককে যুদ্ধ জয়ে বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লী ফিরে যেতে হয় এবং ১৩৫৭ খৃঃ অব্দে দু'দলে সন্ধি হয়—তখন থেকেই বাঙলার স্বাধীনতা দিল্লীর বাদশাহকে মেনে নিতে হয়। একালে ১৯১৪ খৃঃ অব্দে ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে যখন, তখন বাঙালীকে এই যুদ্ধের সৈনিক ক'রে নেওয়া হয়। বাঙালীকে যুদ্ধে যোগ দেবার অধিকার দেন সব প্রথম ফরাসী ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ। ফ্রান্সের সহায়তায় ২৫ জন বাঙালী যুবক এই যুদ্ধে যোদ্ধার সম্মান লাভে এগিয়ে যান, মৃত্যুকে ভয় না ক'রে। ফ্রান্সের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর ছেলেরা প্রথম প্রমাণ ক'রে আসে যে, বাঙালী যুদ্ধ-অপারগ জাতি নয়। বীর বাঙালী যুবক যোগীন্দ্রনাথ সেন ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ১৯১৬ খৃঃ অব্দের ২২শে মে। ইনিই প্রথম বাঙালী যিনি ইউরোপের মহাযুদ্ধে সাধারণ সৈনিক হয়ে মরণ বরণ ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। গত মহাযুদ্ধে দুই হাজার বাঙালী সৈনিক নিয়ে গঠিত

49th. Regiment মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে এসেছে। এ সব জানা সত্ত্বেও বাঙালীকে 'যুদ্ধ-অপরাগ' জাতি ব'লে যারা অপবাদ দিত তারা বাঙালীকে ভয় করতো, এই কথাটাই জেনে রেখো। বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙালীর ছেলে বৈমানিক ইন্দ্রনাথ রায়, কালীপ্রসাদ চৌধুরী, ও আরও অনেকে প্রাণ দিয়ে বাঙালীর গৌরব বাড়িয়ে গেছেন। এছাড়া স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জী ও মেজর জেনারেল অজিতঅনিল রুদ্র এবং কাশ্মীর যুদ্ধে রঞ্জন দত্ত প্রভৃতি বাঙালীর গৌরব বাড়িয়েছেন।

বাঙালীর সেরা 'সাহিত্য-সৃষ্টি' বলতে মোটামুটি কোন্ কোন্ রচনা বা গ্রন্থ বোঝায়?

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—'পদাবলী'; কাশীরাম দাসের—'মহাভারত'; কৃত্তিবাসের— 'রামায়ণ'; মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর—'চণ্ডীমঙ্গল'; কৃষ্ণদাস কবিরাজের—'চৈতন্য চরিতামৃত'; ভারতচন্দ্র রায়ের—'অন্নদা মঙ্গল'; মাইকেল মধুসূদন দত্তের—'মেঘনাদবধ কাব্য'; নবীনচন্দ্র সেনের—'প্রভাস' 'পলাশির যুদ্ধ', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র'; দীনবন্ধু মিত্রের—'নীলদর্পণ'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের —'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'আনন্দমঠ'; রমেশচন্দ্র দত্তের—'জীবন সন্ধ্যা,' 'জীবন প্রভাত'; অক্ষয়কুমার বড়ালের—'এষা'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—গীতাঞ্জলি'; 'গল্পগুচ্ছ,' 'গোরা'; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বৃত্রসংহার'; স্বামী বিবেকানন্দের—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'কর্ম্মযোগ' 'জ্ঞানযোগ', 'পত্রাবলী,' 'ভাববার কথা',; তারকনাথ গাঙ্গুলীর—'স্বর্ণলতা'; মীর মশারফ হোসেনের—'বিষাদসিন্ধু'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের —'চন্দ্রগুপ্ত,' 'হাসির গান,' 'মেবার পতন'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের—'বলিদান,' 'অশোক,' 'প্রফুল্ল'; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের—'রঘুবীর,' আলমগীর,' 'নিবেদিতা'; অমৃতলাল বসুর—'বিবাহ-বিভ্রাট,' 'খাস-দখল'; জলধর সেনের —'হিমালয়'; রাধারাণী দেবীর—'লীলাকমল,' কামিনী রায়ের—'আলো ও

ছায়া' ; অনুরূপা দেবীর—'মা,' 'পোষ্যপুত্র' ; নজরুল ইস্‌লামের—'অগ্নিবীণা' ; অরবিন্দ ঘোষের—'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—'শ্রীকান্ত,' 'শেষপ্রশ্ন,' 'পথের দাবী' ; প্রমথ চৌধুরীর—'চার ইয়ারী কথা,' 'বীরবলের হালখাতা' ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—'বেণু ও বীণা,' 'কুহু ও কেকা,' 'তীর্থরেণু' ; মন্মথ রায়ের—'কারাগার,' 'মীরকাসিম' ; সুবোধ ঘোষের—'ফসিল' ; নিরুপমা দেবীর—'শ্যামলী,' দেবত্র' ; যাযাবরের—'দৃষ্টিপাত' ; মৌমাছির—'নয়াযুগের রূপকথা,' 'পুতুলের দেশ,' 'যারা মানুষ নয়' ; অন্নদাশঙ্কর রায়ের—'পথে-প্রবাসে' ; রবীন্দ্র মৈত্রের—'ত্রিলোচন কবিরাজ' ও 'থার্ড ক্লাস' ; কান্তিচন্দ্র ঘোষের—'ওমর-খৈয়াম' ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'কবুলতি,' 'আমরা কি ও কে ?' ; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের—'ঠাকুরমার ঝুলি' ; সুকুমার রায়চৌধুরীর—'আবোল্‌তাবোল,' 'হযবরল' ; যোগীন্দ্রনাথ সরকারের—'হিজিবিজি,' 'হাসিখুসি,' 'খুকুমণির ছড়া' ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'রাজকাহিনী,' 'বুড়ো আংলা,' 'নালক' ; যামিনীকান্ত সোমের—'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' ; পরশুরামের—'গড্ডলিকা,' 'কজ্জলী' ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'ইছামতী' 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' ; শ্রীমকথিত—'রামকৃষ্ণ কথামৃত' ; প্রবোধকুমার সান্যালের—'মহাপ্রস্থানের পথে ; সজনীকান্ত দাসের—'পথ চলতে ঘাসের ফুল' ; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'ধাত্রী দেবতা,' 'গণদেবতা,' 'পঞ্চগ্রাম;' 'মন্বন্তর' ; বনফুলের—শ্রীমধুসূদন,' 'জঙ্গম' ; সতীনাথ ভাদুড়ীর—'জাগরী' ; সৈয়দ মুজতবা আলীর—'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র' ।

বাঙলাকে আরও ভাল ক'রে জানতে হলে বড় হয়ে কি কি বাঙলা বই পড়তে হবে ?

(১) বাঙলার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বৃহৎ বঙ্গ—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। (৩) বাঙালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। (৪) আমরা বাঙ্গালী—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। (৫) গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। (৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র

সেন। (৭) বাঙলা ও বাঙালী—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। (৮) মধ্যযুগের বাঙলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। (৯) ফিরিঙ্গী বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। (১০) বঙ্গের ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী (১১) পুরাতনী—হরিহর শেঠ। (১২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস।

তুমি ও তোমার শরীর

ঘুম পায় কেন ? জেগে উঠি কি করে ?

এ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক বলেন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের রকমফের হওয়ার ফলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, আর জেগে ওঠে। যখন আমরা জেগে থাকি তখন স্নায়ুকেন্দ্রগুলি রক্তকোষগুলিকে অনবরত খাটিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে মানুষের জাগা অবস্থায় কাজ করতে করতে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই রক্তকোষগুলিও কাজে ঢিলে দেয়, তখন রক্ত চলাচলের বেগটা কমে আসে, ফলে মস্তিষ্কের কাজ করার ক্ষমতাও কমে আসে, তখনই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার যখন বিশ্রাম নেবার পর স্নায়ুকেন্দ্রগুলো কাজে লাগে, মানুষ তখনই জেগে ওঠে।

তৃষ্ণা পায় কেন ?

জেনে রাখো, আমাদের প্রত্যেকের শরীরে 'নিউমো গ্যাসট্রিক' (Pneumo Gastric) ব'লে যে স্নায়ুশ্রেণী আছে সেই স্নায়ুশ্রেণীই পাকস্থলীতে কামনার উদ্রেক করে। যখন শরীরের ভেতরকার প্রয়োজনমত জল কম পড়ে, তখন ঐ স্নায়ুশ্রেণীই মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্রে জানিয়ে দেয় যে শরীরে জলের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পান করার কামনা বা ইচ্ছা জেগে ওঠে আমাদের মনে—একেই বলি আমরা তৃষ্ণাবোধ।

হাই ওঠে কেন ?

হাই ওঠার ব্যাপারটা ঘটে এইজন্যে যে, যখন আমাদের ক্লান্তি বোধ হয়, বা ঘুম পায় তখনই রক্তে অক্সিজেনের অভাব ঘটে তখন নাক দিয়ে যে অক্সিজেনটুকু ফুস্‌ফুসে যায়, তাতে সে অভাবটা মেটে না, তাই হাই উঠে মুখের গর্ত্ত দিয়ে খানিকটা বাতাস সেই অক্সিজেনের অভাবটুকু খানিকটা মেটায়।

নাক ডাকে কেন ?

ঘুমোবার সময় আমাদের শোবার দোষে অনেক সময় আমাদের স্বর-নালীটি স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে বেকায়দায় পড়ে বেঁকে-টেরে যায়। তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে, তার ফলে স্বরনালীটি থেকে বেয়াড়া শব্দ বেরোয়, নাক বা মুখ দিয়ে। অনেকের স্বরনালীটিতে এমন কোন গলদ সব সময়েই থাকে যে জন্য ঘুমোলেই তাদের নাক ডাকে।

মাথার চুলে তেল দিলে বাড়ে, অথচ চোখের পাতার চুলে তেল দিলে বাড়ে না, এর কারণ কি ?

কারণটা আর কিছু নয়, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি cell বা কোষের সমষ্টি, কিন্তু বিভিন্ন অংশের ঐ cellগুলি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। মাথার চুল যে অংশে জন্মায় সেখানের cellগুলি যেভাবে কাজ করে ঠিক সেই ধরণের কাজ চোখের পাতার cellগুলি করে না কাজেই মাথার চুল যে পরিমাণে বাড়ে চোখের পাতার চুল সে পরিমাণে বাড়ে না, এবং সর্ব্বত্র চুলের গোড়ার যে সমস্ত সেল থাকে তার সমষ্টিগত শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি চুলের বাড়বার সীমা আছে, সেই সীমার বেশী কেউ বাড়তে পারে না।

পাকা চুল সাদা হয় কেন ?

পাকা চুল সাদা দেখায় তাতে পিগ্‌মেণ্ট (pigment) ব'লে পদার্থটির অভাব ঘটে। এই পিগ্‌মেণ্ট হচ্ছে এক রকম রঙ-জাতীয় জিনিস।

বুকটা ধুক্‌ধুক্ করে কেন ?

তার কারণ বুকের মধ্যেই আছে দেহের আসল যন্ত্র হৃৎপিণ্ড বা 'হার্ট'। জীবন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এই যন্ত্রটি চলতে সুরু করে—চলে মৃত্যু পর্য্যন্ত। এইটি বন্ধ হলেই দেহের সব কলকব্জা অচল হয়ে পড়ে।

শীতকালে গা, হাত, পা, ঠোঁট ফাটে কেন ?

এর কারণ, শীতকালের আবহাওয়াতে জলীয় অংশ বা moisture খুব কম থাকে ; সব জিনিস থেকে সেই আবহাওয়া জল শুষে নিতে চায়, আমাদের চামড়া, ঠোঁট, হাত, পা থেকেও আবহাওয়া তখন তেল ও জল টেনে নেয়, ওগুলো তখন শুকিয়ে যায় বেশী রকম, তাই তা ফাটে। সেইজন্য শীতকালে গা, হাত, পা ও ঠোঁটে বেশী তেল দেবার ব্যবস্থাটা ভাল। তেল দিলে চামড়া নরম হয় ও সহজে ফাটে না।

কাতুকুতু দিলে হাসি পায় কেন ?

আমাদের হাসির উৎপত্তি হয় প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর পেশীর (Muscle) নড়াচড়ার ফলে। মুখের কতকগুলি পেশী ও শ্বাসযন্ত্রের পেশী সজাগ হয়ে ওঠে—সাধারণতঃ যখন আমরা মস্তিষ্কে কোন আনন্দদায়ক অনুভূতি পাই। কিন্তু এ ছাড়াও জোর ক'রে ঐ মাংস-পেশীগুলিকে সজাগ ক'রে মানুষকে হাসানো যায়, যদি ঐ পেশীগুলির সঙ্গে শরীরের অন্য অংশের যে সমস্ত পেশীর (muscle) যোগ আছে, সেগুলিকে নাড়া দেওয়া যায়। কাতুকুতু দেওয়ার ফলে ঠিক এই পেশীগুলোকে নাড়া দেওয়ার ব্যাপারটাই ঘটে, তাই আমরা না হেসে পারি না।

সর্দ্দি হয় কেন ?

অনেক সময় নাকে শুকনো ঘাস, পাতার গুঁড়ো, ফুলের রেণু বা ধূলিকণা যায়। তখন নাকের Muccous Membrane বা শ্লেষ্মাপট ব'লে অংশটি উত্তেজিত হয়ে নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি জাগায়, ফলে হাঁচির সঙ্গে সর্দ্দি দেখা দেয়। অনেক সময় ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় গায়ে থাকলে বা গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া

লাগলে সর্দ্দি হয়। এর কারণ, ঐ ভাবে ঠাণ্ডা লাগার ফলে চামড়ার নীচের 'রক্তথলি' বা Blood Vesselsগুলো সঙ্কুচিত হয়ে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায়। রক্তপ্রবাহই আমাদের শরীরে প্রয়োজনমত উত্তাপ বজায় রাখে, কাজেই তখন শরীরের স্থায়ী উত্তাপটা কমে আসে এবং রক্তপ্রবাহ শরীরের কোন কোন জায়গায় এসে জমে যায়, বিশেষ করে নাকের ভিতর এবং গলার চামড়ার তলায় রক্তটা বেশী জমে যায়। তখন বাতাসে ভেসে আসা রোগ-বীজাণুগুলো নাকে ঢুকে এই জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে খাবার পেয়ে চট্‌পট্‌ বেড়ে ওঠে—ফলে সর্দ্দি রোগটা দেখা দেয়।

জ্বর হলে 'জ্বরঠোঁট' হয় বা ঠোঁটে ফোস্কা পড়ে কেন ?

জ্বর হলে জ্বরঠোঁট হয় বা ফোস্কা পড়ে এই জন্যে যে শরীরের সামান্য উত্তাপে সহজেই সেটা গরম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঠোঁটের চামড়ার ঠিক নীচেই যে সব রক্তথলি (Blood vessels) আছে তা জ্বরের সময় খুব সহজেই গরম হয়ে ওঠে তাই ঠোঁটে অমন ফোস্কা পড়ে।

চোখ নাচে কেন ?

আমরা সচরাচর যে ব্যাপারকে 'চোখ-নাচা' বলি সেটা আসলে চোখের নাচই নয়। চোখের বাইরে চোখের পাতা বা যে আবরণ আছে, তারই কতকগুলি মাংসপেশী (Muscles) রক্ত চলাচলের গোলমালে ও আরও নানা কারণে ঐভাবে কাঁপতে শুরু করে। সেই মাংসপেশীগুলির স্পন্দনকেই আমরা ভুল ক'রে বলি, 'চোখ নাচা'।

জুতোর ঘষাঘষি লেগে বা পুড়ে গেলে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে কেন ?

এর একমাত্র কারণ উত্তাপ—জুতার ঘষটানিতে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, আর আগুনে উত্তাপ থাকে, সে কথাতো জানই ; এখন উত্তাপ শরীরের যে জায়গাটিতে লাগে—সেই জায়গাটির জলীয় অংশ ও রক্ত, উত্তাপে জলীয় বাষ্প হয়ে জড়ো হয় ঐ জায়গাটিতে। কিন্তু সেই বাষ্প চামড়া ভেদ ক'রে

বেরুতে পারে না বলেই তার চাপে চামড়াটি যায় বেড়ে—তারই মধ্যে আশ্রয় নেয় ঐ বাষ্প। সেটাকেই তো আমরা 'ফোস্কা' বলে থাকি।

বিছুটি গায়ে লাগলে কুট্‌কুট করে কেন?

তার কারণ, বিছুটি গাছের পাতায় দেখবে খুব সরু সরু রেঁায়া আছে। এই রেঁায়াগুলো যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে দেখ, দেখবে ঐ রেঁায়াগুলোর ডগার ওপরটা বলের মত গোল, কিন্তু আমাদের গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গোল ডগাটা ভেঙ্গে গিয়ে আমাদের চামড়ার ভেতর রেঁায়ার ছুঁচ্‌লো ডগাটা যায় ঢুকে। আর ঐ রেঁায়ার ভেতরের ফাঁপা নলে যে বিষাক্ত রস থাকে, সেই রস তখন রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত জায়গাটি ফুলে ওঠে ও কুটকুট করে।

ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে কেন?

কারণ আমাদের গায়ের প্রত্যেকটি লোম ও চুলের গোড়াটার চারিধারে একটা ক'রে খাপের মত জিনিস থাকে, একে বলা হয় লোমকূপ বা Follicle. এই 'Follicle' এর সঙ্গেই থাকে প্রথমতঃ রক্তথলি (Blood vessels) অর্থাৎ যেখানে রক্ত থেকে প্রতিটি চুল তার খাদ্য সংগ্রহ করে; দ্বিতীয়তঃ থাকে কতকগুলি গ্রন্থি বা Glands, এগুলোর কাজ হলো চুলকে নরম আর তেলা করে রাখা। আর থাকে ঐ রক্তের থলির সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলো স্নায়ু (Nerves) ও পেশী (Muscles)। লোমের নীচের এই সঙ্গে পেশীগুলিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ইরেকটর প্যাপিলে' (Erector papillae), তোমরা বলতে পার 'চুল খাড়া করার পেশী'—পেশীগুলির সঙ্গে স্নায়ুর যোগাযোগ আছে। যখন আমরা ভয় পাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক ও দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলোর সঙ্গে লোমকূপের স্নায়ুগুলোও সজাগ হয়ে ওঠে, ফলে ঐ লোম খাড়া করবার পেশীগুলিতে টান পড়ে বা সঙ্কুচিত হয়। তাই ভয় পেলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘুরলে মাথা ঘোরে এবং সব জিনিস ঘুরছে বলে মনে হয় কেন?

যখন তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একই কেন্দ্রে ঘুরপাক খাও, তখন তোমার চোখের সামনে যা কিছু থাকে সবগুলির ছায়া খুব তাড়াতাড়ি তোমার চোখের দৃষ্টিতে অনবরতই বদলে যায়, চোখের দৃষ্টিতে তাই সেগুলিকে তখন সচল বলেই মনে হয়। এই সচল গতির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোও অস্বাভাবিক ভাবে সচল হয়ে ওঠে। তাই তুমি যখন স্থির হয়ে দাঁড়াও তখন মস্তিষ্কের ঐ সচল অনুভূতিটা—দেখার অনুভূতির চেয়ে প্রবল হয়ে থাকে, অর্থাৎ চোখে যদিও তখন আশপাশের জিনিসগুলির মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তবুও মস্তিষ্ক সেটা অনুভব করতে পারে না। তাই তখনও মনে হয় আশে পাশের জিনিসগুলো ঘুরছে, আর মাথাটাও ঘুরছে।

অন্ধকারে দেখতে পাই না কেন?

ক্যামেরার লেন্স দিয়ে যেমন ক্যামেরার পেছনে ঘষা কাচটিতে ছবি প্রতিফলিত হয়, তেমনি আমাদের চোখের মণির ভেতর দিয়ে তার পেছনে, চোখের ভেতর যে পাতলা পর্দ্দা ('অক্ষিপট' বা Retina) আছে, তাইতে আমরা যা কিছু দেখি সেই ছবিটি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন আলোর সাহায্যেই সম্ভব—তাই অন্ধকার জায়গায় কোন জিনিস রেখে যদি ফোকাস করা যায়, তাহলে পেছনের ঘষা কাচে ছবি প্রতিফলিত হয় না। যে জিনিসটি আমরা দেখি তার ওপর আলো প'ড়ে সেটি আবার চোখের মণির ভেতর দিয়ে অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় বলেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে উত্তেজনা জাগায়, তাই আমরা দেখতে পাই—কাজেই যেখানে আলো নেই, সেখানে কোন জিনিস থাকলে তার প্রতিফলন অক্ষিপটে হয় না, তাই আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না।

অন্ধকার কেন ঘুমের সাহায্য করে?

এর কারণ হচ্ছে, তোমরা জানো আলো থেকে গাছপালা পশুপাখী আমরা সবাই অল্পবিস্তর জীবনীশক্তি পেয়ে থাকি, অর্থাৎ আলো আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য এনে জড়তা দূর করে। আচ্ছা এখন জেনে রাখ যে, যখন ঘুম পায়, তখন আমাদের স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও পেশীগুলো সব খেটে খেটে এলিয়ে পড়ে, তারা চায় বিশ্রাম ; কিন্তু তখন যদি আমরা আলো জ্বালিয়ে রাখি সেই আলোর পরশে তখনও ঐ ক্লান্ত স্নায়ুগুলো এলিয়ে পড়া সত্ত্বেও সজাগ হয়ে ওঠে, তারা ছুটি নিতে পারে না অতটা তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ঘুমটা একটু দেরাতেই আসে, কিন্তু আলো না থাকলে তাদের এই চেতনাটা সহজেই কমে আসে, সহজেই তারা শান্ত হয়ে পড়ে, আর আমরাও চট্‌পট্‌ ঘুমিয়ে পড়ি।

টক্‌ খেলে দাঁত টকে যায় ও গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে কেন?

আমাদের দাঁতের ওপরে যে 'কলাই' বা 'এনামেলে'র আবরণ আছে তাতে টক্‌ জিনিসের 'এ্যাসিড' লাগে, আর তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাময়িক ভাবে ঐ এনামেলটা তখন জখম হয়ে পড়ে, ফলে দাঁতের ঐ 'কলাই' বা সাদা পাথরের মত অংশের নাচে যে সব স্নায়ু আছে, সেগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। তাই দাঁত টকে যায় ও তার শিহরণ লেগে দেহের স্নায়ুমণ্ডলীও শির্‌ শির্‌ করে ওঠে।

নখ ও চুল কাটতে ব্যথা লাগে না কেন?

নখ ও চুলের সঙ্গে কোনও নার্ভ বা স্নায়ুর যোগাযোগ নেই ব'লে। স্নায়ুর মারফতেই আমরা সব রকম ব্যথা অনুভব করি, তাই নখ চুল কাটলে আমাদের ব্যথা লাগে না।

ভাল ভাল খাবার দেখলে জিভে জল আসে কেন?

খাবার দেখলে জিভ থেকে যে জল বেরোয় সেটা ঠিক জল নয়, আসলে ওটা লালা। আমাদের মুখের ভেতর জিভের নীচে ও গালের ভেতরের

দেওয়ালে লালা গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি বা গ্লাণ্ডগুলো রক্ত থেকে জল ও অন্যান্য পদার্থ বার ক'রে নিয়ে লালা তৈরী করে এবং লালার আকারে তা-ই ঐ লালা-গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত সূক্ষ্ম নল বেয়ে আমাদের মুখে এসে পৌঁছায়। এই লালা জিনিসটা সব সময়ে আমাদের মুখের ভেতরটিকে ভিজিয়ে রাখে। তাছাড়া যখন আমরা কোন কিছু খাই তখন এই লালা খাবার জিনিসকে ভিজিয়ে নরম করে দেয় ও খাবার চিবানো এবং খাবার গেলার ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলে। খাবার মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জিভের স্বাদ-গ্রন্থির স্নায়ু মারফৎ মস্তিষ্কে খবরটা পৌঁছে যায়, অমনি সেখান থেকে অপর স্নায়ুর মারফৎ লালা-গ্রন্থিগুলোতে উত্তেজনা জেগে ওঠে—ফলে লালা বেরোতে শুরু করে। সময় সময় খুব ভাল ভাল খাবার দেখলে নাক চোখও রীতিমত তার খবরটা তাদের স্নায়ু মারফৎ পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কে—মস্তিষ্ক তখন আগের মতই লালা-গ্রন্থিগুলোকে জাগিয়ে তোলে। তাই রুচিকর খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধ পেলে আগে থেকেই আমাদের জিভে জল দেখা দেয়।

দুটি চোখ দিয়ে আমরা একই জিনিসকে দুটো করে দেখি না কেন? একটা চোখের ওপরটা টিপে ধরলে দুটো করে দেখি কেন?

কারণ সাধারণতঃ দুটো চোখই এমন ভাবে তৈরী যে তারা একসঙ্গে একই ভাবে তাদের আলোক প্রতিফলনের কাজ করে এবং মস্তিষ্কের একই কেন্দ্রে এই দৃষ্টিবোধের চেতনা জাগায়। তবে দুটো চোখ যদি একই ভাবে না থেকে একটু ওলোট-পালোট হয়ে যায় তা হলে আলোক প্রতিফলনের ব্যাপারেও গরমিল ঘটে। তখন আমরা একই জিনিসকে দুটো তিনটে দেখি—এটাই হলো চোখের গোলমাল; চোখ ট্যারা করলে বা একটা চোখের ওপরটা টিপে ধরলে তাই এ ব্যাপারটা ঘটে।

ধুলো-বালি পড়লে বা পেঁয়াজ কাটবার সময় চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন?

এর কারণ হচ্ছে, যতবারই আমরা চোখের পাতা ফেলি, ততবারই আমাদের চোখের কোণে যে অশ্রুগ্রন্থি বা Lachrymal Gland আছে, তা থেকে জল বেরিয়ে আমাদের চোখের গোলকটাকে বা Eye Ballটাকে, অনবরতই ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে এবং সেই জল একটা নালা দিয়ে নাকের মধ্যে চলে গিয়ে শ্লেষ্মার সৃষ্টি ক'রছে; অর্থাৎ আমাদের চোখের গোলকটার ওপর সব সময়েই জল রয়েছে, তবে সেটা আমরা লক্ষ্য করি না, কাজেই, যখন ঠাণ্ডা বাতাস, ধুলো ময়লা বা অন্য কিছু আমাদের চোখের কাজে বাধা দেয় তখনই ঐ গ্লাণ্ড থেকে খুব বেশী জল বেরিয়ে চোখটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে এবং তখন জল এতো বেশী পরিমাণে বেরোয় যে চোখের ঐ নালা ভর্ত্তি হয়ে উপ্‌ছে পড়ে আমাদের গালের ওপর। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে, যখন আমরা পেঁয়াজ ছাড়াই। পেঁয়াজে এক রকম সাদা ঝাঁঝালো তেল আছে, যা বাতাসে উড়ে যায় বা উবে যায়। কাজেই পেঁয়াজ ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ঝাঁঝালো তেলের খুব ছোট ছোট কণা ভেসে এসে আমাদের চোখের গোলকটাতে লাগে আর জ্বালার সৃষ্টি করে,—তাই অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ অশ্রুগ্রন্থি থেকে জল হুড় হুড় ক'রে বেরিয়ে আসে চোখের ঐ গোলকটাকে ঝাঁঝালো তেলের হাত থেকে রক্ষা করতে।

কয়লার ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে কেন?

কয়লার ধোঁয়াতে সাধারণতঃ থাকে জলীয় বাষ্প, কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড এবং সালফার ডায়ক্‌সাইড গ্যাস—ঐ সালফার ডায়ক্‌সাইড ও কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড গ্যাস চোখের জলের সঙ্গে মিশে কার্ব্বনিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডের সৃষ্টি করে এবং এসিডের ক্ষারের সংস্পর্শে এসে চোখের স্নায়ুগুলো আঘাত পায়; তাই ধোঁয়া লাগলে চোখ জ্বালা করে। যে সব জিনিসের ধোঁয়ায় এগুলি বর্ত্তমান থাকে না, তাতে চোখ জ্বালা করে না।

হাতে পায়ে ঝিন্ ঝিন্ ধরে কেন ?

আমাদের দেহে এমন কতকগুলো স্নায়ু আছে, যাদের সাহায্যে আমরা কোনও জিনিস ছুঁলেই টের পাই যে, "ছুঁয়েছি"।—একে বলা হয় 'স্পর্শানুভূতি'। এই 'স্পর্শানুভূতি'টা আসলে হয় আমাদের মস্তিষ্কে—এই স্নায়ুগুলোর মারফৎ। এখন—সময় সময় বেকায়দায় পড়ার ফলে, বা চাপ লেগে হাত পায়ের ওই ধরণের স্নায়ুগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই মস্তিষ্কে সেই স্পর্শানুভূতিটা নিয়ে যেতে পারে না ভাল ক'রে। তখনই মনে হয় হাত-পায়ের ও-জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে, মনে হয় ঝিন্ ঝিন্ করছে। স্নায়ুগুলো তাদের কাজ করতে না পেরে ছটফট্ করে ব'লে ওই ঝিন্ ঝিন্ ধরার ব্যাপারটা ঘটে। অর্থাৎ ঝিন্ ঝিন্ ধরে—স্নায়ুর আক্ষেপের ফলেই।

শোক, দুঃখ, আনন্দ বা আঘাত পেলে মানুষ কাঁদে কেন ?

শোক, দুঃখ, আনন্দ বা আঘাত পেলে মানুষের মস্তিষ্কের কতকগুলি তারে (স্নায়ুতে) কাঁপন লাগে এবং সেই কাঁপনের ঢেউ এসে লাগে চোখের অশ্রু-গ্রন্থিতে (Tear Gland); তখনই ঐ টিয়ার গ্লাণ্ড বা অশ্রুগ্রন্থি থেকে হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে পড়ে। এই জল ঐ গ্লাণ্ডগুলোর সাহায্যে আমাদের শরীরের রক্ত থেকেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয় এবং এই ভাবে চোখ দিয়ে জল বার হওয়ার ব্যাপারটাকেই 'কান্না' বলা হয়।

দুটো কান আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ করে দিলে কানের ভেতর এক রকম গুর্ গুর্ শব্দ শোনা যায়, এর কারণ কি ?

এর কারণ সহজ ক'রে বুঝতে হলে, বুঝতে হবে প্রথম শব্দটা কি ক'রে আমরা শুনতে পাই। কানের বাইরের দিকের গর্ত দিয়ে শব্দতরঙ্গ ঢুকে ধাক্কা দেয় কানের Eardrum-এর ওপর, এর ওপরে শব্দঢেউ লেগে সেটা কাঁপতে থাকে এবং সেখানকার স্নায়ুমণ্ডলীর মারফৎ সেটা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়। Eardrum-এর বাইরের দিকে যেমন কানের গর্ত বা নল

আছে (অর্থাৎ যেটাতে আমরা কলম বা পেন্সিল ঢুকিয়ে কানের ময়লা বার করি) ঠিক তেমনি ধারা আর একটা নল আছে কানের পর্দার পেছন থেকে গলার ভেতর অবধি। এই নলটিকে বলা হয় Eustachian Tube (অষ্টাচিয়ান নল)। এই নলটিতে সব সময়েই বায়ু ভর্ত্তি থাকে—এই জন্য যে, কানের পর্দাটা বাইরের হাওয়ার চাপে যেন একপেশে না হয়ে পড়ে অর্থাৎ দু' পাশের বায়ুর চাপে সেটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকে শব্দের কাঁপন ধরবার জন্যে। কাজেই যখন আমরা বাইরের দিকের কানের গর্ত্তটা আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ ক'রে দিই, তখন ঐ ভেতরকার নলে হাওয়ার যে চাপ থাকে তাতেই কানের পর্দাটা কাঁপতে থাকে এবং সেই কাঁপনের ফলে সেখানে একটা শব্দেরও সৃষ্টি হয়—সেটাই শুনতে পাই তখন ঐ রকম 'গুর্ গুর্' আওয়াজের আকারে।

কানে 'খোল' হয় কেন? ঐ 'খোল' জিনিসটা কি?

'খোল' পদার্থটি হচ্ছে কানের মল। কানের ভেতরের যে ছেঁদাটি দিয়ে শব্দ যায়—সেই ছেঁদাটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, এই চামড়াতে কতকগুলি গ্রন্থি বা গ্লাণ্ডস (Glands) আছে। এই গ্লাণ্ড থেকে একরকম চট্‌চটে রস বেরোয়—তা' জমে জমেই কানে খোল জন্মায়। কানের ছিদ্রপথে রোগ-বীজাণু ঢুকলে ঐ 'খোলের' আঠায় আটকে যায়—তাতেই কান রক্ষা পায়। তবে কানে 'খোল' খুব বেশী জমলে শব্দের গতিপথ বন্ধ হয়ে যায়—সেই জন্য মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা দরকার।

এক এক জন মানুষের গলার স্বর এক এক রকম হয় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষের স্বরনালী এবং যেখান থেকে গলার আওয়াজের উৎপত্তি, সেই সব তন্ত্রীগুলো সবাইকার সমান আকারের নয়। যাদের গলার আওয়াজ মোটা, তাদের স্বরতন্ত্রীগুলো (Vocal chord) বড় আর মোটা—যাদের গলার আওয়াজ মিহি তাদের স্বরতন্ত্রীগুলো ছোট এবং সরু। কাজেই এস্রাজের সরু বা মোটা তারে ঘা দিলে যেমন

সরু বা মোটা আওয়াজ বেরোয়, তেমনি মানুষের স্বরনালী ও স্বরতন্ত্রীর গড়ন অনুযায়ী সরু মোটা আওয়াজ বেরোয়।

গলা ভাঙে কেন?

মানুষের গলার ঐ স্বরতন্ত্রীগুলো বড় দুর্ব্বল—ঠাণ্ডা লাগা, সর্দ্দি, কাশি হওয়া বা অতিরিক্ত চীৎকার প্রভৃতির ফলে ওগুলো অতি সহজেই সাময়িক-ভাবে অসাড়ত্ব পায়। স্বরতন্ত্রীর এই সাময়িক অসাড়ত্বই হ'ল স্বরভঙ্গ বা গলা ভাঙ্গার কারণ। অনেক সময় 'ল্যারিংস' বা স্বরযন্ত্রটি ফুলে ওঠার ফলেও স্বরভঙ্গ ঘটে থাকে।

গরম কালে ঘাম হয়, শীতকালে ঘাম হয় না কেন?

জবাবটা হচ্ছে এই যে, গরমকালে আমাদের শরীরের ভেতরকার উত্তাপটা ভয়ানক রকম বেড়ে যায়। কিন্তু এই উত্তাপ বাড়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কাজেই তখন প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী চামড়ার তলায় রাশি রাশি রক্ত ছুটে যায় এবং ঐ রক্ত শরীরের উত্তাপে জল হয়ে চামড়ার সূক্ষ্ম ছেঁদা বা ঘর্ম্ম-গ্রন্থির (Sweat glands) ভেতর দিয়ে ঘাম হয়ে বাইরে আসে এবং বায়ুর সংস্পর্শে এসে এই জল হাওয়ায় উবে যায়। যখন ঐ উবে যাওয়া ব্যাপারটা ঘটে, জল তার সঙ্গে খানিকটা উত্তাপ তখনই নিয়ে যায়, এইভাবে ঘাম বেরুনো ও সেটা উবে যাওয়ার ফলে শরীর তার বাড়তি উত্তাপটাকে কমিয়ে উত্তাপটিকে ঠিক ক'রে নেয় তার দরকার মত। শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শরীরের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাই থাকে। কাজেই বাড়ন্ত উত্তাপ কমাবার জন্যে ঘামের তখন দরকারই হয় না। তাই আমরা শীতকালে ঘামি না।

যখন আমরা বেশী পরিশ্রম করি বা ব্যায়াম করি, তখন ঘাম হয় কেন?

যখন আমরা বেশী পরিশ্রম করি বা ব্যায়াম করি, তখন আমাদের শরীরের উত্তাপ যোগায় যে খাদ্যগুলো, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে বা হজম হয়ে

যায়। ফলে আমাদের শরীর যতখানি গরম হওয়ার দরকার, তার চেয়ে বেশী গরম হয়ে ওঠে। কাজেই প্রকৃতির সুন্দর ব্যবস্থা অনুযায়ী চামড়ার নীচে বেশী পরিমাণে রক্ত ছুটে যায়। আগেই পড়েছ, শরীরের বাড়ন্ত উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে ঘামের সৃষ্টি করে। গায়ের চামড়ার অসংখ্য ছেঁদা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে হাওয়ায় উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে উত্তাপটাও সঙ্গে নিয়ে যায়, কারণ Evaporation বা উবে যাওয়ার ধর্ম্মই হ'ল উত্তাপ কমানো। এইভাবে পরিশ্রম বা ব্যায়ামের ফলে যে বাড়ন্ত উত্তাপের সৃষ্টি হয়, ঘাম সেটাকে কমিয়ে শরীরের ভেতর ঠিক যতটুকু উত্তাপ দরকার মাপমতো ততটুকু উত্তাপেই বেঁধে শরীরকে স্বস্তি দেয়।

শীতকালে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় কেন ?

ব্যাপারটা হচ্ছে, নাক মুখের ঐ ধোঁয়াটা জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নয়। শীতকালে বাইরের হাওয়ার উত্তাপটা মুখের ভেতরের উত্তাপটার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে ব'লে, ভেতরের জলীয় বাষ্প বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে খুব ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়, আর সেটা ঐ ধোঁয়ার মত দেখায়। গরমকালেও মুখ দিয়ে ঐ রকম জলীয় বাষ্প বেরোয়, তবে বাইরের উত্তাপ তার চেয়ে বেশী থাকে বলেই সেটা তখন ওভাবে জলকণায় পরিণত হয় না, তাই তখন ঐ রকম মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে দেখা যায় না।

রক্ত লাল কেন ?

রক্তের তরল অংশকে বলা হয় প্লাজমা (Plasma)। এই প্লাজমাতে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট চাকতির মতো এক রকম জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে—এগুলোকে বলা হয় রেড করপাসেল্‌স (Red Corpuscles) বা লাল কণিকা—এগুলো আসলে কিন্তু লাল নয়; এগুলোর রঙ হচ্ছে ঘন হলদে, তবে তারা অনেকগুলো এক সঙ্গে থাকার ফলেই মানুষের চোখে এই লাল রঙের আভাস পাওয়া যায়। এই লাল কণিকা একটা কত ছোট জান ? এক

ইঞ্চি মাপের বত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। আমাদের শরীরে যতটা ওজনের রক্ত আছে তার অর্দ্ধেকের বেশী হচ্ছে এই লাল কণিকা।

শীতকালে শীত করে কেন? কাঁপুনি ধরে কেন?

প্রথমতঃ, আবহাওয়ার উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ব'লে। দ্বিতীয়তঃ, তারই ফলে আমাদের শরীরের ভেতরে যে তাপ তৈরী হচ্ছে তাও তাড়াতাড়ি বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ফলে শীত পায় বা কাঁপুনি ধরে। কাঁপুনিটা হয় তখন এই জন্যে—দেহকে উত্তপ্ত করার জন্য দেহের ভেতরের যন্ত্র মাংসপেশীগুলোকে সচল ক'রে তোলে। এই কাঁপুনিটাই দেহকে তখন গরম ক'রে তোলার চেষ্টা করে—কাঁপুনির ফলে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। গরম কাপড় চোপড় দিয়ে মুড়ি দিয়ে বসে থাকলে দেখবে কম শীত করবে, কারণ তখন দেহের ভেতরকার ঐ উত্তাপটা বাইরে গিয়ে আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে ঠাণ্ডা হতে পারে না। দেহের তাপ ভেতরে থেকেই শরীরটিকে গরম রাখে।

হাঁচি কেন হয়?

হাঁচি পড়লে বোঝা যায় যে, কোনো রোগ-বীজাণু বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো পদার্থ নাকের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে এবং তাই নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো জোর করে তাকে বার করে দিতে চাচ্ছে। হাঁচি পড়ে বা হাঁচি হয় ঐ কারণেই।

স্বপ্ন জিনিষটা কি? মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন?

স্বপ্ন জিনিসটাকে অল্প কথায় বলা চলে ঘুমের ভেতর সচেতন অবস্থা—সাধারণতঃ আমরা যখন ঘুমোই, তখন আমাদের স্নায়ুগুলো অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করে; ফলে বাইরের জগতের সাড়া মস্তিষ্কে পড়ে না, কিন্তু মনের গহন থেকে চেপে রাখা ইচ্ছাগুলি আবার জেগে ওঠে; অনেক ভুলে যাওয়া বিষয় আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ইচ্ছাগুলি তখন মনের চেতনার স্তরে

এসে সিনেমার ছবির মতো ঘটনা সৃষ্টি করতে থাকে। এই সব ঘটনাকে ঘুমের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার নামই 'স্বপ্ন দেখা'। যাদের ঘুম খুব গাঢ় হয়, তারাও পাঁচজনের মতই স্বপ্ন দেখে, তবে তারা জাগে যখন স্বপ্নের কথা তখন তাদের একটুও মনে থাকে না। তাই লোকে বলে যে যারা অঘোরে ঘুমোয় তারা স্বপ্ন কম দেখে।

চোখে সাবান লাগলে জ্বালা করে কেন? সাবান দিলে ময়লা অত সহজে পরিষ্কার হয় কেন?

চোখে সাবান লাগলে জ্বালা করে এই জন্যে যে, সাবানে সোডিয়াম, পটাশিয়ম, এমোনিয়ম প্রভৃতি ধাতব লবণ বা ক্ষার জাতীয় জিনিস খুব বেশী পরিমাণে থাকে এবং ঐ ক্ষার জাতীয় জিনিস আমাদের চোখের স্নায়ুগুলোতে একটা আঘাত দেয় বা সাড়া জাগায়, তাই আমরা জ্বালা অনুভব করি। সাবান দিলে ময়লা পরিষ্কার হয়, তার কারণ ময়লাকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা ও জলের সঙ্গে সহজে মেশবার ক্ষমতা দুই-ই আছে ঐ ধাতব লবণের।

মানুষ জলে ডুবে মরে যাবার পর ভেসে ওঠে কেন?

মানুষ জলে ডুবে মরলে প্রথমে সে জলের তলায় তলিয়ে যায়। ভেসে ওঠে মরার অনেক পরে। এর কারণ মৃত্যুর ফলে আমাদের দেহের নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটে—রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরধ্বংসকারী জীবাণুরা দেহকে আক্রমণ ক'রে সেটিকে পচিয়ে তোলে। এই পচন-ক্রিয়ায় দেহের ভেতরে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তাতেই জলের চেয়ে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্বটা কমে যায় এবং দেহটা তাই জলে ভেসে ওঠে।

জল, হাওয়া, আলো ও উত্তাপ

ফুটন্ত জলে চাল দিলে ফুলে ভাত হয়ে ওঠে কেন—ঠাণ্ডা জলে কেন অমন হয় না?

এর কারণ, আসলে একটি চালের দশভাগের নয় ভাগই হলো শ্বেতসার বা ষ্টার্চ্চ (Starch)। এই শ্বেতসার পদার্থটি হচ্ছে বিভিন্ন অনুপাত অনুযায়ী কার্ব্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মিশ্রণে কতকগুলো খুব সূক্ষ্মদানা বা গ্রানিউল (Granule)-এর সমষ্টি। এই যে সূক্ষ্মদানা এগুলি ঠাণ্ডা জলে গলে না বা পরস্পরের সঙ্গে আলাদা হয়ে যায় না, বরং একটি অপরের গায়ে বেশী ক'রে লেগে যায়। কিন্তু গরম জলের উত্তাপে এই প্রত্যেকটি দানা বা 'গ্রানিউল' যায় ফেটে এবং তখন তাই থেকে এক রকম আঠালো পদার্থ বার হয়; তাই ফুটন্ত জলে চাল দিলে ফুলে ভাত হয়ে ওঠে।

দুধে জ্বাল দিলে সর পড়ে, অথচ জলে জ্বাল দিলে সর পড়ে না কেন?

দুধে মাখন বা চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ থাকে বলেই দুধ জ্বাল দিলে আগুনের তাপে সেটা সরের আকারের দুধের জলীয় অংশের ওপরে ভেসে ওঠে ও আস্তে আস্তে ঘনীভূত হয়ে সর হয়ে দাঁড়ায়। জলে অমন কোন মাখন বা চর্ব্বি জাতীয় জিনিস তো থাকে না, তাই সর পড়ে না।

দুধে জ্বাল দিলে উথলিয়ে পড়ে অথচ ফুঁ দিলে উথলান কমে যায় কেন?

এর জবাব হচ্ছে, দুধ যখন জ্বাল দিয়ে গরম করা হয়, তখন দুধের চর্ব্বি (Fat) ও ছানা (Casein) অংশ দুধের ওপরে ভেসে ওঠে এবং ফেনার সৃষ্টি ক'রে একটা পর্দ্দার মত তৈরী করে, যার ফলে দুধের জলীয় অংশ উত্তাপে বাষ্প হয়ে বাইরে বেরোতে না পেরে দুধটাকেই ঐভাবে ফুলিয়ে তোলে। তখন ফুঁ দিলে উথলানোটা কমে এই জন্যে যে, আমাদের মুখের বাতাসের

বেগে ঐ ফেনার পর্দ্দাটা চার পাশে সরে যায়, সেই সুযোগে দুধের জলীয় অংশের বাষ্প খানিকটা বাইরে বেরোবার পথ পায়।

পাথুরে চুনে জল দিলে গরম ধোঁয়া বেরোয় কেন?

এটাকে বলা চলতে পারে রসায়নের খেলা—বিজ্ঞানের জগতে অহরহই এমন ব্যাপার ঘটছে। একটা রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে আর একটা পদার্থ মিশে আর একটা নূতন জিনিস তৈরী হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তবে এইটুকু জেনে রাখ চুনটা তৈরী হয় এক জাতীয় পাথর পুড়িয়ে। এর আর একটা নাম হলো 'ক্যালসিয়াম কার্ব্বোনেট' (Calcium Carbonate)। রাসায়নিক মতে জল-অণু বা Water Molecule থাকে না বলেই জল পেলে তখনই তাতে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেটা তখন হয়ে যায় ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Calcium Hydroxide)।

ঘরে আগুন ধরলে চারিদিক থেকে হু হু করে এত বাতাস আসে কেন?

এর সোজা জবাব হচ্ছে এই যে, বাতাসের ধর্ম্মই হ'ল, বায়ুমণ্ডলীতে যদি কোন জায়গার বায়ু কোন রকমে গরম হয়ে ওঠে, তখনই সেখানে চারিপাশের ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে যায়। তাই যেখানে আগুন লাগে সেখানে ওপরকার বাতাস হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে, আর সেইজন্যে অত বাতাস ঝড়ের বেগে সেখানে এসে হাজির হয়।

আগুনের শিখা সব সময়ই উপরমুখো হয়ে জ্বলে কেন?

ব্যাপারটা হচ্ছে, যখনই কোনও আগুন জ্বালানো হয়, তখনই বাতাসের মধ্যে যে জায়গাটুকু দখল ক'রে আগুন জ্বলছে, সেখানে 'অক্সিজেন' ও 'কার্ব্বন' এ দুটি জিনিসের মেশামিশিতে এক রকম গ্যাস তৈরী হতে থাকে। এই গ্যাস আমাদের চারপাশের বাতাসের চেয়ে হাল্কা, কাজে কাজেই সেটা আশপাশের বাতাস সরিয়ে ওপর দিকে উঠে যায়, তাছাড়া ঐ ভাবে

আশপাশের বাতাস ঐ গ্যাসকে ওপরে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে নীচের দিক দিয়ে এসে আগুনের শিখায় অনবরতই অক্সিজেন যোগায়, এই জন্যই আগুনের শিখা উপরমুখো হয়ে জ্বলে সব সময়।

মাটির তৈরী হাঁড়ি, কলসী বা ইট আগুনে পোড়ালে অমন লাল হয়ে যায় কেন?

জবাব জেনে রেখো, যে মাটি দিয়ে ওগুলো তৈরী হয় তাতে 'আয়রণ-অক্সাইড' (Iron-Oxide) ব'লে পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই ঐ সব মাটির তৈরী জিনিস যখন ভাটিতে পোড়ানো হয় তখন সেখানকার আগুনের তাপের মাপমতো ঐ জিনিসগুলির মাটিও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙ বদ্‌লে অন্য ধরণের মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

রঙের সৃষ্টি হ'ল কোথা থেকে?

এর জবাব,—আলোই হল রঙের উৎস, আলো যেখানে নেই, কোনও রঙেরও অস্তিত্ব নেই সেখানে। তার কারণ আলোর সাহায্যে মাত্র দুই উপায়ে 'রঙ' যে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি। প্রথমতঃ রঙিন পদার্থে আলো প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সেটাকে রঙিন দেখি, দ্বিতীয়তঃ স্বচ্ছ রঙিন পদার্থের মধ্য দিয়ে যে আলো আসে সেই আলোতে আমরা রঙের আভাস পাই। সূর্য্যের সাদা আলো রামধনুর সাতটি রঙে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে, একেই বলা হয় স্পেকট্রাম (Spectrum) বা বর্ণালী। এই যে সাতটি রঙ, এর মধ্যে মাত্র তিনটি রঙকে বলা হয় Primary Colour বা আদত রঙ, আর বাদবাকী-গুলোকে বলা হয় Secondary Colour বা মিশেল রঙ। এখন আবার ঐ আলোকরশ্মির রঙ আর রঙিন জিনিসপত্রের রঙের দুটি আলাদা আলাদা ব্যাপার, অর্থাৎ এই Primary বা আদত রঙ তিনটি ঐ দুইক্ষেত্রে এক নয়, একটু তফাত আছে। জিনিসপত্তরে সাধারণতঃ যে সব রঙ আমরা দেখি তার মধ্যে আদত তিনটি রঙ হচ্ছে—লাল, নীল আর হল্‌দে। এই রঙ তিনটিকে আলাদা আলাদা মাপে মেশালেই আলাদা রঙ তৈরী হয়।

ছায়া আর প্রতিবিম্বে তফাৎ কি ?

আলোর সামনে যখন কোন জিনিস আসে, সেটি তখন আলোর পথ রোধ করে। কাজেই যে আলোকরশ্মিগুলি আটক পড়ে, ঠিক তার উল্টোদিকে সেই জায়গাটুকু অন্ধকারেই থেকে যায়—আলোবিহীন এমন অন্ধকার অংশটুকুকেই 'ছায়া' বলা হয়। 'প্রতিবিম্ব' হচ্ছে আলোর সাহায্যে কোন পদার্থের অবিকল রূপটির প্রতিফলিত ছবি। আয়নাতে, জলে বা ঐ ধরণের যে কোন জিনিসে এই যে ছবি ফুটে ওঠে তাকেই বলা হয় 'প্রতিবিম্ব'।

আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে কেন ? আর কেনই বা প্রতিবিম্বতে ডান হাতটাকে বাঁ হাত ব'লে মনে হয় ?

এটা বুঝতে হ'লে আমাদের জানা উচিত যে আলোকরশ্মি খুব চকচকে পালিশ করা জিনিসে গিয়ে যখন ধাক্কা খায়, তখন কি হয়! কি হয় জানো ? তোমরা জানো একটা রবারের বলকে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারলে ফিরে আসে। বলটা যদি Right angle বা ৯০° ডিগ্রী angle-এ ছুঁড়ে মারো, তাহ'লে সেটা সোজাই ৯০° ডিগ্রী angle-এ ফিরবে, আবার যদি টেরচা করে ছুঁড়ে মারো, তাহ'লে যত ডিগ্রী angle-এ ছুঁড়বে, উল্টো দিকে ঠিক তত ডিগ্রী angle-এর মাপেই বলটা আসবে। আলোকরশ্মিও ঠিক ঐ ভাবেই ঠেক খেয়ে ফেরে। ধরো, যদি আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াই তাহ'লে আলোকরশ্মি যে কোণ বা angle-এ আমাদের শরীরটাতে এসে ঠেক খেয়ে সরল রেখায় গিয়ে পড়ে ঐ আয়নার ওপর, বলের মত আবার ঠিক সেই কোণ অনুযায়ী ফিরে আসে চোখের পর্দায়—অর্থাৎ ফেরবার পথেও আলোকরশ্মির angle-এর মাপ একই থাকে ; খালি গতিটা হয় উল্টো দিকে। আয়নার ওপরে প্রতিফলিত হয় আমাদের দেহের ওপরের আলোকরশ্মি, কিন্তু উল্টো হয়ে সটান আবার আমাদের চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়, কাজেই তখন আমরা আয়নার ভেতর আমাদের চেহারা দেখতে পাই, আর ঐ উল্টো দিকে আলোকরশ্মির গতি ব'লে, ডান হাতটাকে বাঁ হাত বলে মনে হয়

অর্থাৎ সবই উল্টো দেখি। আয়নার প্রতিবিম্ব, ওটা আলোরই খেলা। সে কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে চাও যদি খুব অন্ধকারে আয়নাতে মুখ দেখবার চেষ্টা ক'রো।

দূরের জিনিস ছোট দেখায় কেন?

অল্প কথায় হচ্ছে, যে জিনিসটাকে আমরা দেখি তার ওপরদিকের আলোর সীমারেখাটা আর নীচের দিকের আলোর সীমারেখা পরস্পরকে কাটাকুটি ক'রে উল্টো হয়ে চোখের ভিতরের পর্দ্দায় (Retina) ক্যামেরার ফোকাসের (Focus) মতো পড়ে। ক্যামেরার ফোকাসে যেমন দূরের জিনিস ছোট দেখায়, তেমনি চোখের পর্দ্দায় দূরের জিনিস ছোট দেখায়। অর্থাৎ কাছের জিনিসের আলোর সীমারেখা দুটো কাটাকাটি করে যেখানে মেশে সেখানে 'কোণটা' (Angle) হয় মাপে বড়, আর দূরের জিনিসের বেলায় 'কোণটা' হয়ে যায় ছোট, তাই চোখের পর্দ্দায় দূরের জিনিসটি ছোট আকারেই প্রতিফলিত হয়।

শীতকালে নারকেল তেল জমে যায়, অথচ সরষের তেল জমে না কেন?

নারকেল তেলে চর্ব্বির (fat acid) পরিমাণ বেশী। চর্ব্বি বা fat acid-কে তরল রাখবার জন্যে যেটুকু উত্তাপ দরকার, বাইরের আবহাওয়াতে তখন তা পাওয়া যায় না—কারণ শীতকালে বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায় অনেক বেশী। সরষের তেলে ঐ জাতীয় চর্ব্বি (fat acid) খুব কম পরিমাণে আছে তাই ওটা শীতকালেও জমে না। তবে খুব বেশী ঠাণ্ডায় রাখলে সরষের তেলও ঘোলা হয়ে ওঠে এবং জমে যায়।

মোমবাতি বা প্রদীপের আগুনে ফুঁ দিলে নিভে যায় অথচ টিকে, কাঠকয়লা ও কয়লার আগুনে ফু দিলে আগুন জ্বলে ওঠে কেন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আগুন প্রথমতঃ জ্বলে 'অক্সিজেন' আর 'কার্ব্বন' এই দুটোর Combustion বা সংঘর্ষের ফলে। কিন্তু 'কার্ব্বনের' মাপ

অনুযায়ী উপযুক্ত অক্সিজেন চাই, তবে এই আগুন জ্বলবে। কম বেশী হ'লে চলবে না। মোমবাতি বা প্রদীপে কার্ব্বনের সৃষ্টি হয় ঐ বাতির চর্ব্বি বা তেল থেকেই। কাজেই তাতে 'কার্ব্বন' যে পরিমাণ থাকে, তবে তার পক্ষে তোমার মুখের জোরালো ফুঁ বা দমকা হাওয়াতে মেশানো অক্সিজেনটা মাত্রায় বেশী হয়ে পড়ে। কাজেই আগুনও নিভে যায়। অন্য দিকে কাঠকয়লা, টিকে বা কয়লাতে কার্ব্বন বা 'অঙ্গারে'র অংশটা খুব বেশী—সেইজন্যে বাতাস বেশ জোরেই দরকার, নইলে আগুন জ্বলবে না।

ঘাম লাগলে বা খোলা হাওয়ায় রূপা ও তামার জিনিস কালো হয়ে যায় কেন?

ঘামের সঙ্গে 'গন্ধক'-জাতীয় পদার্থ থাকে এবং হাওয়াতে গন্ধকযুক্ত জলজান (Sulphurated Hydrogen) কিংবা 'সালফার ডায়ক্সাইড্' থাকে। এই গন্ধকজনিত রাসায়নিক ক্রিয়াতে রূপা ও তামার জিনিস ঘামে এবং খোলা হাওয়াতে কালো হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালে যত তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ময়লা হয় শীতকালে তার চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি ময়লা হয় কেন?

এর কারণ হচ্ছে গরমকালে আমাদের চারপাশের বায়ু গরম থাকার ফলে বায়ুর জলীয় অংশের চাপ হাল্কা হয়ে আমাদের অনেক ওপরে থাকে—কিন্তু শীতকালে বায়ুমণ্ডলীতে থাকে ঠাণ্ডার ভাগ বেশী, বায়ুর জলীয় অংশের চাপটাও থাকে বেশী কাছাকাছি, ফলে নীচের ধুলো ও ধোঁয়া গ্রীষ্মকালের মতো ওপরে উঠতে পারে না অত সহজে। সেইজন্যে শীতকালে ধুলো আর ধোঁয়াটা বেশী লাগে আমাদের গায়ে, আর জামা-কাপড়ে—তাই তারা তাড়াতাড়ি ময়লা হয়।

চিল, শকুন প্রভৃতি পাখীরা পাখনা না নেড়ে কি করে আকাশে উড়ে বেড়ায়?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ঐ সমস্ত পাখীরা সাধারণতঃ যে উচ্চতায় উড়ে বেড়ায়, সেখানে বায়ুর চাপ খুব বেশী, দ্বিতীয়তঃ ওদের ডানাও খুব মজবুত;

ওরা তাই সেখানে পৌছায় শুধু হাওয়ায় ভর করে, পাখা দুটো মেলেই হাওয়ার ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়। সেখানকার বায়ুর চাপ এমনই যে তাদের শরীরের ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity) ভারসমতা ঠিক রেখে তারা ডানা না নেড়েই ওপরে উড়ে বেড়াতে পারে। তবে চিল, শকুন যখন মাটি থেকে ওপরে উঠতে শুরু করে তখন ডানা নাড়তে হয়, কারণ সেখানকার বায়ুর চাপ, তাদের শরীরের ভারকেন্দ্রে ভারসমতা রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো মাইল বেগে ঘুরছে অথচ পাখীরা যখন আকাশে ওড়ে তখন তারা কি ক'রে বাসায় ফিরে আসে?

এটা কি করে ঘটে জান? পৃথিবীর মাঝখান থেকে একটা শক্তি আমাদের সব সময় টেনে রেখেছে তার দিকে, যার ফলে আমরা পৃথিবী ঘোরা সত্ত্বেও ছিট্‌কে পড়ি না। এই যে শক্তি একে বলা হয় 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'; এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে শূন্যের বায়ুমণ্ডলীকেও টেনে রেখেছে, কাজেই যখন পাখীটাকে ওপরে উড়তে দেখ, তখন সে মাটির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকলেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বাঁধা থাকে, কাজেই সেও ঐ বায়ুস্তরের মধ্যে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরছে এবং ঐ একই বেগে। তবে পৃথিবীর ওপরের মাটি থেকে, শূন্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মাইলের বেশী দূরে যদি কোন রকমে পাখীটা গিয়ে পড়ে, তাহলে সে আর ফিরতে পারবে না; কারণ অতদূর পর্য্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পৌছায়।

দার্জ্জিলিং হলো পাহাড়ের উপর, অর্থাৎ ঐ জায়গাটি কলকাতার চেয়ে সূর্য্যের কাছাকাছি, অথচ সেখানে গরম না হয়ে ঠাণ্ডা হয় কেন?

ঠাণ্ডা এইজন্যে যে, যদি আমরা আমাদের ওপরের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে যাই, তাহলে প্রতি ৩০০ ফিটে এক ডিগ্রী ক'রে বায়ুর তাপ কমে যাবে, কাজেই সূর্য্যরশ্মির উত্তাপটাও ঐ সব জায়গায় বায়ুমণ্ডলীর ঠাণ্ডা

হাওয়াতে অনেক কমে যায়, তাই ওসব জায়গা গরম না হয়ে হয় ঠাণ্ডা। তাছাড়া আর একটা কারণ, পৃথিবীর ভেতর থেকে মাটির ওপর যে উত্তাপ অহরহ বার হচ্ছে, সেটাও পাহাড়ের ওপর পর্য্যন্ত পৌঁছবার আগেই অনেক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

শিশির-বিন্দু কি? গ্রীষ্মকালে শিশির দেখা যায় না কেন?

গরমকালে বাইরের গরম হাওয়া নদী, নালা, বিল প্রভৃতি থেকে অনেক পরিমাণে Moisture বা আর্দ্রতাকে গ্রাস করে ফেলে বলেই তখন 'শিশির' দেখা যায় না। কিন্তু শীতকালের রাত্তিরে আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকে এবং মেঘের চাপ পৃথিবীকে গরম ক'রে রাখে না, তখন মাটি, গাছ, পাথর সবাই নিজের নিজের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; কাজে কাজেই বাতাসও এই সব জিনিসের সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হতে থাকে; এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া গ্রীষ্মের গরম হাওয়ার মত অতটা জলীয় বাষ্প গ্রাস করতে পারে না, ফলে খানিকটা আর্দ্রতা (Moisture) ঘনীভূত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলে পরিণত হয় এবং খোলা জায়গায় মাটিতে গাছপালায় জিনিসপত্রে আশ্রয় নেয়। গাছের পাতায়, ঘাসে, লতায় এদের তাই আমরা শীতকালের সকালে উঠেই দেখতে পাই। এই জলের ফোঁটাগুলিকেই বলে 'শিশির'।

কুয়াসা জিনিসটা কি?

কুয়াসা হচ্ছে অসংখ্য জলবিন্দুর সমাবেশ, যার প্রত্যেকটা জলবিন্দুর ভেতরে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা ধোঁয়ার কণা। একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপের আবহাওয়াই কেবলমাত্র কতকটা আর্দ্রতাকে বা Moistureকে অদৃশ্য বাষ্পের আকারে গ্রাস করতে পারে। কিন্তু যখনই কোন ঠাণ্ডা পদার্থ বা ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আবহাওয়ার ওই নির্দ্দিষ্ট উত্তাপটা কমে যায়, বা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তখনই সে অদৃশ্য বাষ্প তরল জলীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই জলীয় পদার্থের খানিকটা ঘনীভূত হয়ে ঘাস, গাছ, পাতাকে আধার

ক'রে সেখানেই জলবিন্দু গড়ে; সেই জলবিন্দুগুলো হ'লো 'শিশির'। কিন্তু ওই অদৃশ্য বাষ্প যখন বায়ুমণ্ডলীয় ধূলিকণা বা ধূমকণাকে আধার ক'রে, তারই ওপর জলবিন্দু তৈরী ক'রে হাওয়ার দোলায় চেপে শূন্যে ভেসে বেড়ায়, তখনই তাকে 'শিশির' না ব'লে বলি আমরা 'কুয়াসা'।

সোনায় পারা লাগলে রূপার মত সাদা হয়ে যায় কেন ?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন অগলিত সোনার সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা একমাত্র পারদ বা পারা ধাতুটিরই আছে। এর বেশী বুঝিয়ে বলতে অনেক জায়গা লাগবে এবং তা বেশ শক্ত হবে।

বাতাসটা কি জিনিষ ?

রাসায়নিকেরা বলেন, বাতাসটা হচ্ছে কতকগুলো গ্যাসের সংমিশ্রণ। মোটামুটি বাতাসের শতকরা ২১ ভাগ হচ্ছে 'অক্সিজেন', ৭৮ ভাগ 'নাইট্রোজেন' আর এক ভাগ হচ্ছে 'আর্গন' গ্যাস। এই তিন রকমের গ্যাস ছাড়াও বাতাসে আছে 'হিলিয়াম' (Helium), 'নিয়ন' (Neon), 'জেনন' (Xenon) আর ক্রিপ্‌টন (Krypton) গ্যাস। কার্ব্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসও খুব সামান্য আছে ব'লে জানা যায়।

কাঠ যখন আগুনে পোড়ে তখন ফট্‌ফট্‌ শব্দ হয় কেন ?

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যদি এক টুকরো কাঠ রেখে দেখ, দেখবে কাঠের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ফাঁক আর গর্ত্ত। এই সমস্ত গর্ত্তে হাওয়া বন্ধ হয়ে থাকে। কাজেই যখন কাঠ পুড়তে আরম্ভ করে, তখন ঐ সমস্ত গর্ত্তে বাতাস চট্ করে গরম হয়ে ওঠে। হাওয়া গরম হলেই বাড়তে থাকে। হাওয়াটা ঐ ভাবে বেড়ে ওঠার ফলে ঐ সমস্ত গর্ত্তে চাড় লাগে এবং তার ফলে কাঠের খণ্ডগুলো নানা জায়গায় ফাটতে থাকে। এই ফাটার শব্দই আমরা শুনতে পাই যখন কাঠ পোড়ে।

ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি হয় কি ক'রে?

খানিকটা জায়গা যখন আশপাশের বায়ুমণ্ডলীর চেয়ে বেশী গরম হয়ে ওঠে, তখন ঐ জায়গাটার চারধারের বায়ু ঐ গরম বায়ু ভর্ত্তি জায়গাটা দখল ক'রতে ছুটে আসে সেখানে। যদি তখন ঐ গরম জায়গার বায়ু আর ঐ চারপাশের বায়ুর উত্তাপের তফাৎটা বেশীরকম হয়, তাহ'লে ঐ চারপাশের বায়ুর ছুটে আসার গতিটাও খুব বেড়ে ওঠে; কাজেই তখন ঐ চারপাশের ঠাণ্ডা বাতাস ঘূর্ণির আকারে ঐ ভাবে ঘুরতে শুরু করে। সে জন্যেই এই ধরণের বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় ঘূর্ণিবায়ু।

ভূমিকম্প হয় কেন?

এর জবাবে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন যে পৃথিবীতে আমাদের পায়ের তলায় মাটির নীচে, অনেক নীচে, যে শক্ত পাহাড় আছে সেগুলোতে 'ফাট' ধ'রে একটা আর একটার ঘাড়ে ভেঙে পড়ে। এই যে ভেঙে-পড়া, ইংরেজীতে একে বলা হয় Faulting। এই ভাবে মাটির তলার পাথুরে পাহাড়ে চিড় খাওয়ার ফলে ওপরের মাটি কেঁপে ওঠে, তাকেই আমরা বলি "ভূমিকম্প"। ভূমিকম্পের আর একটা কারণ কেউ কেউ বলেন "অগ্ন্যুৎপাত" বা Volcanic erruption। পৃথিবীর ভেতরের জমাট-বাঁধা উত্তাপ যখন মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে, তাতেও কাঁপন লাগে পৃথিবীর ওপরের মাটিতে, এটাও একটা কারণ বটে ভূমিকম্পের। তবে আগের কারণটাই যে বড় বড় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে, এটা বৈজ্ঞানিকরা জোর ক'রেই বলে থাকেন।

গরম 'ইস্তিরি' ঘসলে কাপড় যেমন সমতল ও সমান হয়, ঠাণ্ডা 'ইস্তিরি' ঘসলে অমন হয় না কেন?

তার কারণ গরম 'ইস্তিরি' কাপড়চোপড়ের সুতোয় বাতাসের যেটুকু আর্দ্রতা থাকে তাকে নষ্ট করে তার সুতোর 'অণুকণা' বা Molecule

গুলোকে বেশী সচল কোরে তোলে, তাতেই অতি সহজেই সূতোর আড়ষ্টভাব নষ্ট হয়ে যায়। তাই তখন সহজে কাপড়ের সূতোগুলো সমান ও টান হয়ে কাপড় জামাকে সমতল ও মসৃণ করে তোলে। ঠাণ্ডা ইস্তিরিতে তা সম্ভব নয়।

সমুদ্রের জল নীল এবং লোনা কেন ?

এ সম্বন্ধে জার্ম্মান রসায়নবিদ্ রিচার্ড উইল ষ্টেটারের মত হচ্ছে যে, সমুদ্রের জলে তামা মেশানো পদার্থের ভাগটা বেশী, আর বিভিন্ন সমুদ্রের জলে তামার ভাগ কম বেশী ঘটার ফলে কোন সমুদ্র কম নীল, কোনটা বা বেশী। যে সমুদ্রের জল যত নীল সেখানকার জল তত লোনা। নদীর জলের চেয়ে সমুদ্রের জল লোনা এই কারণে যে, নদীর তলার মাটি হচ্ছে বেলেমাটি, তাতে নুন খানিকটা শুষে নেয়, কিন্তু সমুদ্রের তলা পাথরের মত শক্ত বলেই নুনের ভাগটা ঐ ভাবে শুষে নেয় না, বরং রোদ লেগে নুন শুকিয়ে বা ঘন হয়ে যাওয়ার ফলে জলের নোন্‌তা ভাবটা দিন দিনই বেড়ে চলে।

জলে-দুধে মিশ খায়, কিন্তু তেলে-জলে মিশ খায় না কেন ?

দুধে আর জলে মিশ খায়, তার কারণ, ঐ দুটো তরল পদার্থের ভেতরে যে ছোট ছোট 'অণু' বা Molecule থাকে, তারা পরস্পরের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারে; অর্থাৎ তারা একই মাপের Molecule, কিন্তু যখন বিভিন্ন জাতের Molecule বা বিভিন্ন মাপের Molecule-কে একসঙ্গে মেশাবার চেষ্টা করা হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। কাজেই সে-সব জিনিস একটা আর একটার সঙ্গে মেশে না। জলের সঙ্গে তেল মেশে না সেই কারণেই—জলের 'অণু' বা Molecule-গুলো তেলের 'অণু'র চেয়ে আকারে অনেক ছোট। জলের 'অণু'কে বলা হয়, 'পোলার মলিকিউল' (Polar Molecule), আর তেলের অণুগুলো হচ্ছে 'নন্-পোলার' (Non-Polar)।

শিলাবৃষ্টি হয় কেন?

বৃষ্টির সময় জলের ফোঁটাগুলো সময় সময় প্রবল হাওয়ার বেগে মাটির দিকে না এসে ওপর দিকে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই জলবিন্দুগুলো ঠাণ্ডা লেগে বরফ হয়ে জমে যায়, আবার বায়ুর বেগ কমলে এইগুলিই মাটিতে এসে পড়ে বৃষ্টির সঙ্গে; এই বরফের টুকরো-গুলোকেই বলা হয় 'শিলা'।

হারিকেনের গরম চিমনিতে ঠাণ্ডা জল দিলে বা ঠাণ্ডা কাচের গেলাসে ফুটন্ত গরম জল ঢাললে কাচ অমন ফেটে যায় কেন?

তার কারণ চিমনিটা যখন গরম থাকে তখন গরম কাচ যে সব 'মলিকিউল' বা 'অণুকণায়' গঠিত সেই অণুকণাগুলো উত্তাপের ধর্ম্ম অনুযায়ী উত্তাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত অবস্থায় সেগুলি সচলই থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা জল শুধু চিমনির বাইরের দিকের দেওয়ালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অংশটুকুর অণুকণাগুলোর সচলতা যায় কমে। ফলে সেখানকার কাচটা কিছু সঙ্কুচিত হয়। অথচ চিমনির ভেতরের দিকে 'অণুকণা'গুলো উত্তপ্ত থাকায় তাদের সচল গতি একই ভাবে থাকে এবং সেই গতিবেগ বাইরের সঙ্কোচনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারার ফলেই সেখানে চাড় লেগে কাচটা অমন ফেটে যায়। ঠাণ্ডা কাচের গেলাসে ফুটন্ত জল ঢাললেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে অর্থাৎ গেলাসের ভেতর দিকের কাচ-অণুগুলো সহসা বেশী সচল হয়ে উঠে বাইরের দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায়।

শীতকালে পুকুরের জল ঠাণ্ডা, কুয়োর জল গরম কেন?

এর কারণ শীতকালে আমাদের চারপাশের বাতাস থাকে ভয়ানক ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়াচ লেগে পুকুরের জল অমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে—কিন্তু কুয়োর জল থাকে অনেক নীচে, সেখানে বাতাস আসা যাওয়া ক'রতে পারে না অমন সহজ ভাবে। তাই শীতকালে কুয়োর জল গরম

মনে হয়। আর ঠিক ঐ কারণে গরমকালে—গরম হাওয়া কুয়োর জলের সংস্পর্শে এসেও তাকে গরম করে তুলতে পারে না, তাই গরমকালে কুয়োর জল ঠাণ্ডা।

আগুনে জল দিলে আগুন নিভে যায় কেন ?

এই জন্য যে, আগুনের ওপর যখন জল ঢালা হয়, তখন আগুনের তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়, সেই জলীয় বাষ্প ভেদ ক'রে তখন বাতাস বা অক্সিজেন আগুনে পৌছতে পারে না, কাজেই বাতাস না পেয়ে আগুনও নিভে যায়। বাতাস ছাড়া আগুন যে জ্বলে না তাও বুঝতে পারছ।

বরফ জলে ভাসে কেন? ঠাণ্ডায় যখন জল জমে যায় তখন আকারে বাড়ে না কমে ?

সমানআয়তনের বরফ সমানআয়তন জলের চেয়ে হাল্কা বলেই বরফ জলে ভাসে, অর্থাৎ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) বরফের চেয়ে বেশী। ঠাণ্ডায় সব জিনিসই সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ঠাণ্ডায় জল জমে 'বরফ' যখন হয়, তখন আকারে বেড়েই যায়। এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড যে কেন ঘটে, তা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে অনায়াসে বলা যায় বিশ্বের মঙ্গলের জন্য।

মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না কেন ?

মরুভূমির উপরেও মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেখা গেছে, তবে মাটি অবধি পৌছায় না, কারণ মাটিতে পৌছবার আগেই মরুভূমির গরম তাপে বৃষ্টির জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তাই মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না।

প্রতিধ্বনি কি ?

প্রতিধ্বনিটা আর কিছুই নয়, শব্দের প্রতিফলন বা শব্দের ঢেউয়ের কোন কিছুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসাটা। শব্দের ধর্ম্মই হচ্ছে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়া। কিন্তু যখন সে তার গতিপথে কোন বাধা পায় তখনই তা ফিরে

আসে। ফাঁকা ঘরে বা কুয়োর ভেতর আওয়াজ করলে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়। কারণ শব্দকে গ্রাস করার (absorb) মত কোন জিনিস সেখানে থাকে না, কাজেই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বদ্ধ বায়ুতে শব্দটা ফিরে আসে। এই ফিরে আসা শব্দটাকে প্রতিধ্বনি হিসাবে আমরা শুনতে পাই।

বিদ্যুৎ চম্‌কালে বা বন্দুক ছুঁড়লে আগে আলো দেখতে পাওয়া যায়, আর পরে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কেন?

এই জন্য যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত। আর তাছাড়া বিদ্যুৎ চমকালে তার আগুনই বায়ু-তরঙ্গে ঐ শব্দের সৃষ্টি করে, কাজেই আগে আলো, তার পরে তো গর্জ্জন। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব ওপর থেকে পড়লে অত জোরে শব্দ হয়ে ভাঙে কেন?

তার কারণ ইলেকট্রিক বাল্‌বগুলো 'ভ্যাকুয়াম' বা 'বায়ুশূন্য' হয়—কাজেই যখন বাল্‌বটা ওপর থেকে পড়ে ভাঙে, তখন বাইরের বাতাস সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ঐ বায়ুশূন্য জায়গায় ছুটে যায়, বাতাসের এই সংঘর্ষ থেকেই ঐ শব্দের আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই।

ছুঁচ জলে ডোবে অথচ বড় বড় জাহাজ জলে ডোবে না কেন?

ছুঁচ জলে ডোবে, কারণ নিরেট লোহা আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী জলের চেয়ে ভারী। জাহাজ ডোবে না এই জন্যে যে, জাহাজের মাল-মশলা লোহা লক্কড়, কলকব্জা—এ সবের ওজন আর এর ভেতরে যে বাতাস থাকে, তার ওজন এক ক'রলেও জাহাজ যে-পরিমাণ জল সরিয়ে জলের ওপর ভাসে, সেই জল-পরিমাণের ওজনের চেয়ে জাহাজের মোট ওজন কম বা হাল্কা থাকে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্বটা কমই থাকে, কাজেই জাহাজ জলে ভাসে।

নারিকেলের ভেতরে জল কোথা থেকে আসে ?

মোটামুটি জেনে রাখো যে, নারিকেলের জলটা প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী নারিকেল গাছের শরীরের কারখানায় তৈরী হয়। এবং জল, হাওয়া, রোদ আর গাছের শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকেই রস টেনে নিয়ে নারিকেল ফলটি তার ঐ জলটি তৈরী করে নেয়।

টেলিফোনে কি ক'রে কথা শোনা যায় ?

মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই—তুমি যেই টেলিফোনে কথা বললে, অমনি তোমার কথার শব্দ থেকে 'শব্দ-ঢেউ' (Sound waves) তৈরী হলো। সেই ঢেউ টেলিফোনের মাউথপিস্ বা যেখানে মুখ রেখে কথা বলছো, তার ভেতর দিয়ে গিয়ে সেখানে যে 'ডায়াফ্রাম' (Diaphragm) আছে তাকে কাঁপিয়ে তুললে—এবং ডায়াফ্রামের নীচেই ঠিক মাঝখানে বোতামের মত যে জিনিস আছে, সেটাও তখন কাঁপতে লাগল ঐ কাঁপনের ঢেউ লেগে। এই বোতাম বা Button-এর নীচেই আবার খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব কার্ব্বনের গুঁড়ো রাখা আছে এবং এই গুঁড়োগুলির মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনবরতই যাওয়া আসা করছে। এখন শব্দের ঢেউয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ঐ বোতামটির চাপ কখনও বেশী কখনও কম হয়ে পড়ছে ঐ কার্ব্বনের গুঁড়োর ওপর। যখন কার্ব্বনের গুঁড়োর ওপর বেশী চাপ পড়ছে তখন কারেন্টও বেশী যাচ্ছে—যখন চাপ পড়ছে কম, তখন কারেন্টও কম যাচ্ছে। এইভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, ঠিক সেই মত কখনও কম কখনও বেশী কারেন্ট তার বেয়ে চলে যাচ্ছে, যে তোমার কথা শুনছে তার রিসিভার যন্ত্রে সেখানে পৌঁছেই ঐ কারেন্টটা আবার একটা ছোট্ট ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটের "তার-কুণ্ডলী" বা কয়েলের (coil) ভেতর দিয়ে গিয়ে "রিসিভার-যন্ত্র" বা যেটি শ্রোতার কানে লাগানো আছে তার "ডায়াফ্রাম"কে কাঁপিয়ে তুলছে। এই কাঁপন আবার সেখানের বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। এই শব্দ-তরঙ্গই

স্নায়ু মারফৎ শ্রোতার মস্তিষ্কে কথার অনুভূতি জাগায়। তখনই টেলিফোনে কথা শোনা যায়।

খালি ঘরে কথা বললে আওয়াজটা গম্‌গমে হয় কেন ?

এর কারণ, আমাদের চারপাশের আসবাবপত্র সব কিছুই বাতাসের শব্দ-তরঙ্গ থেকে কিছু শব্দ গ্রাস ক'রে নেয়। খালি ঘরে ঐ ধরণের কিছু থাকে না ব'লে শব্দতরঙ্গ শক্ত দেওয়ালে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং তাই আওয়াজটা খুব গম্‌গমে হয়—ইটের দেওয়াল দেওয়া ঘরে আওয়াজ যতটা গম্‌গমে হয়, কাঁচা মাটি বা কাঠের দেওয়াল দেওয়া ঘরে ততটা গম্‌গমে হয় না। তার কারণ, কাঠ বা নরম মাটির শব্দ গ্রাস করবার ক্ষমতা আছে ইটের চেয়ে বেশী।

গ্রামোফোন রেকর্ডে কথা ও সুর কেমন ক'রে তোলে ?

সব কথা বলতে অনেক জায়গা লাগবে। মোটামুটি জেনে রাখো প্রথম যাঁর গান বা কথা রেকর্ডে তুলতে হয় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ষ্টুডিওতে। সেখান থেকে তাঁর গলার আওয়াজটাকে বা 'শব্দতরঙ্গ'গুলোকে "মাইক্রো-ফোন" ব'লে একটা যন্ত্রের সাহায্যে 'বিদ্যুৎ-তরঙ্গে' পরিণত ক'রে নেওয়া হয় রেকর্ডিং রুমে। এখানে ঠিক গ্রামোফোনের মতই একটা কলে রেকর্ডের বদলে রাখা হয় রেকর্ডের মাপমতই একটা এক ইঞ্চি পুরু 'মোমের' চাকৃতি এই চাকৃতিটা প্রতিমিনিটে ৭৮ বার ঘোরে। এর পর যখন গায়ক ও বক্তা গলার আওয়াজ লাউড্‌স্পীকারে ঠিকমত পাওয়া যায়, তখন ঐ মোমে চাকৃতির ওপর একটা পিনের মত জিনিস ছুঁইয়ে দেওয়া হয়, ঠিক যেম ক'রে তোমরা গ্রামোফোন বাজাবার সময় 'সাউণ্ড-বক্সে' পিনটা লাগি রেকর্ডের ওপর আস্তে আস্তে রাখো, ঠিক তেম্নি ক'রে। গায়কের গলা স্বর বা শব্দ-তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে বিদ্যুতের ঢে ঐ মোমের চাকৃতির ওপরের পিনটাকে নাচাতে ও কাঁপাতে থাকে ; ওদিে চাকৃতিটা তো ঘুরছেই ; ফলে রেকর্ডের ওপর খাঁজগুলো সরু দাগের আকা

পরপর গড়াতে থাকে। উপরন্তু শব্দের জোরের কম বেশী অনুযায়ী 'পিন'টি নেচে নেচে কখনো বেশী গর্ত্ত করে কখনো কম গর্ত্ত করে, অর্থাৎ রেকর্ডের ওপর ঐ যে লাইনগুলো দেখ, ওর ভেতরে আছে পাহাড়ের মত উঁচু নীচু জায়গা, তাছাড়া পিনের কাঁপনের ফলে আবার ঐ খাঁজের দেওয়ালগুলোও শব্দের কাঁপন অনুযায়ী ঢেউখেলানো হয়ে যাচ্ছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে রেকর্ড্রের লাইনগুলো নদীর মত আঁকাবাঁকা আর তার ভেতরটাও উঁচু নীচু; গ্রামোফোন বাজাবার সময় পিনটা ঐ উঁচু নীচু জায়গার ওপর দিয়ে খাঁজের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে চলে, ফলে 'পিন'টা সেই শব্দ-তরঙ্গগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে 'সাউণ্ড-বক্সে'র ডায়াফ্রামে (diaphragm); তাই আমরা রেকর্ডে গান শুনতে পাই। এখন ঐ যে মোমের চাকৃতি তৈরী হ'লো, ঐটাই হ'লো আসল রেকর্ড। ওর থেকে তখন Electrotyping উপায়ে ছাঁচ তৈরী ক'রে তার ওপর পিচ, রজন প্রভৃতি জিনিস মেশানো, কনডেন্সাইট (Condensite) ব'লে একরকমের কালো জিনিস চেপে ধ'রে ছাপ নেওয়া চলে অন্য আর একটা কলে। ঐগুলোই হলো আমাদের গ্রামোফোন রেকর্ড।

গাছপালার জগৎ

গাছ তো তার পাতা আর শেকড় দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, তবে গাছের ছাল কাটলে গাছ মারা যায় কেন?

এর কারণ গাছের শেকড়ই জল এবং জলের আকারে খনিজ লবণ ইত্যাদির রস টেনে নিয়ে গাছের শরীরের পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতর যেমন শিরা উপশিরার মারফৎ রক্ত চলাচলের

ব্যবস্থা আছে, গাছের শরীরেও বিভিন্ন তন্তু বা টিস্থর (Tissue) মারফৎ পাতা এবং বোঁটায় সেইভাবেই সেই রস পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত Tissue বা গাছের সূক্ষ্ম শিরাগুলি থাকে ঐ গাছের ছালের নীচেই, কাজেই গাছের ছাল কেটে নিলে গাছের খাগু পাওয়ার যথেষ্ট অস্থবিধে হয়, তাই গাছ ম'রে যায়।

গাছের বয়স ঠিক করা যায় কি ক'রে ?

গাছের বয়স ঠিক করতে হ'লে, গাছকে আড়াআড়ি ভাবে কাটলে দেখা যাবে তার ছালের নীচেই রয়েছে গাছের 'কাণ্ড' বা গুঁড়ি; গুঁড়িটা আবার কতকগুলো স্তরের সমষ্টি। প্রত্যেক বছর গাছের গুঁড়িতে এই রকম একটি ক'রে স্তর পড়ে, গুঁড়িতে যতগুলি স্তর দেখতে পাবে, গাছের বয়স তত বছর।

কোন্ গাছ সব চেয়ে বেশী দিন বাঁচে ?

আমাদের দেশে অশ্বত্থ আর বটগাছ সবচেয়ে বেশী দিন বাঁচে ; ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মিঃ ফ্রান্সিস্ জর্জ্জহিথ্ বিলাতের গাছগুলো কে কতদিন বাঁচে তার একটা হিসাব বার করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, 'সিডার' (Cedar) গাছ বাঁচে ২০০০ বছর, 'ইউ' গাছ বাঁচে ৩২০০ বছর ; সব চেয়ে বেশী নাকি এই গাছের পরমায়ু।

কোন্ গাছ সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে ?

সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে বাঁশ জাতের গাছ—কোনও কোনও জাতের বাঁশ রাতারাতি এক ফুট বাড়ে, এমন নাকি দেখা যায়।

অধিকাংশ গাছের পাতাই সবুজ হয় কেন ?

অধিকাংশ গাছের পাতাই সবুজ এই জন্যে যে, গাছের পাতা সূর্য্যরশ্মির সাতটা রঙের মধ্যে যে লাল ও বেগুনে রঙ থাকে তা গ্রাস ক'রে নেয়, কিন্তু সবুজ রঙকে গ্রাস করে না। গাছের পাতা এই সবুজ রঙ থেকে তার জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করে। এই জীবনী-শক্তি ছোট ছোট অণুর আকারে পাতার

ভেতরের কোষে কোষে ভাসতে থাকে। এই সূক্ষ্ম অণুগুলিকে বলা হয় 'ক্লোরোপ্লাষ্ট' (Chloroplast), এর মানে করতে পার সবুজ 'জীবনী-শক্তি'। যে পদার্থটি অহরহ এই অণুগুলিকে সবুজ ক'রে রাখে তাকে বলা হয় 'ক্লোরোফিল্' (Chlorophyll)। এই সৃষ্টি সূর্য্যের আলো থেকেই। গ্রীক ভাষায় 'Chloros' কথাটির মানে সবুজ, আর 'Phyllon' কথাটির মানে পাতা, তার থেকেই কথাটির উৎপত্তি।

গাছে পাতা হয় কেন ?

গাছে পাতা হয় এই জন্যে যে, গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে গাছের খাবার যে রস, তা ঐ পাতারাই জমিয়ে রাখে তাদের কোষগুলোতে। এ ছাড়া পাতার আরও অনেক কাজ আছে—গাছের জন্য সূর্য্যের আলো ধরা, বাতাস থেকে কার্ব্বনিক এ্যাসিড গ্যাস টেনে নিয়ে গাছকে বড় ক'রে তোলা সে সব করে ওই পাতারা। গাছের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ঐ পাতারাই করে। পাতা ছাড়া গাছের ডালপালা বা শেকড় এ কাজগুলি করতে পারে না।

গাছের পাতা হলদে হয়ে ঝরে যায় কেন ?

দিনের পর দিন গাছটি গাছের পাতায় 'ক্লোরোফিল' (Chlorophyll) তৈরী করবার উপযোগী রস জোগায় বলেই আমরা গাছের পাতাকে সবুজ দেখতে পাই। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন পাতার কোষ বা 'cell'-গুলো গাছের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনমত সব জিনিসের জোগান আর পায় না। এটা সাধারণতঃ ঘটে ঋতু বা আবহাওয়া অনুযায়ী। কারণ আসলে গাছরা ভারী হুঁশিয়ার, সে যখন দেখে যে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রসের জোগানটা কমে আসছে, তখনই সে তার পাতায় পাতায় 'ক্লোরোফিল' তৈরী করবার উপযোগী রসের জোগান দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে শুধু শেকড়, গুঁড়ি আর ডালপালাকে রস জুগিয়ে আসল দেহটিকেই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কাজেই তখন রসের জোগান না পেয়ে পাতাগুলোর 'জীবনী-শক্তি'

যায় কমে, 'ক্লোরোফিল' (Chlorophyll) তৈরী না হওয়াতে পাতাগুলোর ভেতর হলদে রঙ 'ক্যারেটিন' দেখা যায়, তাই অমন হলদে হয়ে গিয়ে কুঁচকে কুঁকড়ে ঝরে পড়ে।

কোন্ গাছ সবচেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ে?

'লিচেন' (Lichen) ব'লে এক রকম গাছ আছে, যার বাড় অত্যন্ত কম। পঞ্চাশ বছরে এই গাছ একহাতের বেশী বড় হয় না; কিন্তু এই গাছ বেঁচে থাকে প্রায় দুশো বছর।

লজ্জাবতী লতা ছুঁলেই পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব বৈজ্ঞানিকেরা সঠিক আবিষ্কার করতে পারেন নি, তবে এটুকু জেনে রাখ যে, গাছেরও জীবনীশক্তি আছে। জীব-জগতে স্নায়ুস্পন্দনের সাহায্যেই এই ধরণের ব্যাপার ঘটে। সেই আন্দাজ ক'রে বলা চল্‌তো এটা ঐ গাছের স্নায়ুতে সাড়া জাগায়, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্নায়ু বলতে যা বোঝায় তা গাছপালার নেই। তাই এখনও এই ব্যাপারটা এক রহস্য।

বসন্তকালে গাছপালার নতুন পাতা হয় কেন?

তার কারণ বসন্তকালেই চারপাশের আবহাওয়ার উত্তাপ ও রৌদ্র সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গাছপালার উপযোগী খাদ্য তৈরী ক'রে দিতে সক্ষম হয়, তখন তারা মাটি থেকে বেশী রস পায়, আকাশ থেকে বেশী রৌদ্র পায়; তাই তারা তখন পায় নতুন জীবন। গাছপালার জীবনে ঐ দু'টোই সবচেয়ে বেশী দরকার —এটি নিশ্চয়ই জান। বসন্তকালে আলো হাওয়া জল উপযুক্ত পরিমাণে পেয়ে শুধু গাছপালা নয়, সব জীবজন্তু আর মানুষের মধ্যেও নতুন জীবনের সাড়া জাগে।

কোন্ গাছের পাতা আকারে সবচেয়ে বড় হয়?

সব চেয়ে বড় আকারের পাতা দেখা যায় সিলোন বা সিংহলে 'টালিপট পাম' ব'লে তাল জাতীয় গাছে। এর পাতা আমাদের দেশের তালপাতার মতই

দেখতে, তবে তার চেয়ে অনেক বড় হয়। এই পাতা দিয়ে সেখানে ছাতা তৈরী হয়।

ফুলের গন্ধ আসে কোথা থেকে? ফুলের কেন গন্ধ থাকে?

ফুলের গন্ধটা সাধারণতঃ আসে গাছ তার শরীরের ভেতরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যে তেল বা গন্ধসার (Essence) উৎপাদন করে তার থেকেই। ফুল-গাছের এই যে তেলটি তৈরী হয়, সেটি কিভাবে হয়, সে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক তথ্য। তবে এই যে তেল, সেটা সাধারণতঃ পেট্রোল বা তারপিন তেলের মত হাওয়ায় উড়ে যায়, তাই আমরা গন্ধ পাই। ফুলের যে সুগন্ধ হয় এর দরকার কি? এর দরকার তোমার আমার জন্য নয়, গাছের নিজের দরকারেই তারা করে এই গন্ধের সৃষ্টি এবং ফুলে যে মিষ্ট গন্ধ থাকে সে গন্ধ আমরা গাছের পাতায় বা গাছের শেকড়ে পাই না। গাছ তার সুগন্ধটি ফুলেই জমিয়ে রাখে, তার কারণ ফুলের রেণু থেকেই হয় বীজের সৃষ্টি ; এই ফুলের রেণু মৌমাছি, প্রজাপতি বা ঐ ধরণের পোকামাকড়, যারা ফুলকে ফলে পরিণত করে বা অন্য উপায়ে বীজ সৃষ্টির সাহায্য করে, তাদের আকর্ষণ করার জন্যেই ফুল গন্ধ ছড়ায় আকাশে বাতাসে চারিদিকে। তাছাড়া ফুলের গন্ধের ঝাঁঝে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর বহু ছোট ছোট বীজাণুও নষ্ট হয়। প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি জাতির পোকামাকড় রঙ ও গন্ধ নাকি খুব সহজেই অনুভব করতে পারে।

সব ফুলে সুগন্ধ থাকে না কেন?

তার কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত ফুলের রেণুই যে মৌমাছি, প্রজাপতি বা কীটপতঙ্গের সাহায্যে বীজে পরিণত হয় তা নয়, চারিধারের বাতাসই অনেক সময় কোনও কোনও ফুলের রেণু সংগ্রহ করে নিয়ে উড়িয়ে ফেলে নতুন ফুলে এবং তাতেই বীজের সৃষ্টি হয় ; কাজেই সে ক্ষেত্রে প্রজাপতি, মৌমাছি বা কোন কীটপতঙ্গকে টেনে আনার জন্য সেই সমস্ত ফুলের একেবারেই গন্ধের দরকার হয় না, তাই সব ফুলের সুগন্ধ থাকে না।

সবুজ রঙের ফুল দেখা যায় কিনা?

খাঁটি সবুজ রঙের ফুল বড় একটা দেখা যায় না। এদেশের কাঁঠালী চাঁপা ফুলের রঙটা গোড়াতে প্রায় সবুজ থাকে, তার পরে হলদে হয়ে যায়। খাঁটি সবুজ রঙের ফুলও ফোটানো হয়েছিল উদ্ভিদবিদ্‌দের চেষ্টায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে, 'বাল্টিমুরে'। এই ফুলটি 'ভিরডিফ্লোরা' ব'লে গোলাপ জাতের গাছে ফুটেছিল।

সূর্য্যমুখী ফুল সব সময়ে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কেন?

এর কারণ গাছপালা আর ফুল এদের মধ্যে কারুর কারুর সূর্য্যের দিকে আকর্ষণটা খুব বেশী থাকে এবং তাদের এই আকর্ষণ বা টানের ধর্ম্মকে ইংরেজীতে বলা হয় "Heliotropism"। এই "Heliotropism" সূর্য্যমুখী ফুলে খুব বেশী থাকে, অর্থাৎ সূর্য্য কিরণটা প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তার একান্ত প্রয়োজন, সেই কারণেই সূর্য্যমুখী ফুল ঐ ভাবে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

ডুমুরের ফুল হয় না কেন?

ডুমুরের ফুল হয় না একথাটা সত্যি নয়, কারণ যে ডুমুর ফলটি দেখ, ওটিই আসলে ডুমুরের ফুল। একটা ডুমুরের ফল যদি দু' আধখানা ক'রে কেটে আতস কাচ দিয়ে দেখ, দেখবে তার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ির মত জিনিষ, এগুলিই ডুমুরের ফুল। ইংরেজীতে এই ছোট ছোট ফুলের মত জিনিসকে বলা হয় Florets।

সব চেয়ে বেশী দিন ফল দেয় কোন্ গাছ?

নাসপাতি বা 'পিয়ার' গাছ ৩০০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থেকে ফল দেয়, এটা নাকি দেখা গেছে। সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী ফল দেয় আখরোট গাছ। এক এক বছরে একটা আখরোট গাছে নাকি ১ লক্ষ আখরোট ফল ফলেছে এও দেখা গেছে।

কুকুরদের ও-রকম গা-ঘামার তেমন কোনও ভাল ব্যবস্থাই নেই। কারণ ওদের ঘর্ম্ম-গ্রন্থিগুলো আছে মাত্র পায়ের থাবায়, তাই ওরা গরমের দিনে ওভাবে জিভ বার ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

বিড়ালের চোখ রাত্রিতে জ্বলে কেন ?

শুধু বিড়ালের চোখ নয়, রাত্রিতে আরও অনেক জীবজন্তুর চোখ ও-রকম জ্বলে; এর কারণ হচ্ছে মানুষের মতই বিড়াল বা এই সমস্ত জীবজন্তুরও দেখবার জন্য ক্যামেরার লেন্সের মত জিনিসটা ছাড়াও চোখের ভেতরের দেওয়ালে 'ট্যাপেটাম' বলে একটা পদার্থের প্রলেপ থাকে। এই 'ট্যাপেটাম' থেকে এক রকম উজ্জ্বল আলো তাদের চোখের পর্দ্দা বা রেটিনায় প্রতিফলিত হয় ও ঐ জীবগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখবার শক্তি দেয়। এই আলো দিনের আলোয় দেখা যায় না, রাত্তিরেই দেখা যায়, তাই মনে হয় রাতের বেলায় বিড়ালের চোখ জ্বলে।

মাছি যখন পা উপর দিকে করে ঘরের ভিতরের ছাদে হেঁটে বেড়ায় তখন পড়ে যায় না কেন ?

এর কারণ, মাছিদের প্রত্যেকটি পায়ে একটা প্যাডের মত চাকতি থাকে। এগুলো এমনভাবে তৈরী যে দেওয়ালে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বায়ুশূন্য হয়ে দেওয়াল বা ছাদের গায়ে কামড়ে ধরে। তাই মাছি উল্টো হয়ে যখন ঘরের ভিতরে ছাদে হেঁটে বেড়ায়, তখন পড়ে যায় না।

গরু কোন কিছু খাবার পর আবার জাবর কাটে কেন ?

এর কারণ গরুর খাবার হজম করার ব্যাপারটা একটু অন্য ধরণের। মানুষ কোন কিছু খাবার পর, মানুষের খাবারটি পাকস্থলীতে যাবার পরই হজম হয়ে যায়। গরুর সেরকম ব্যবস্থা নেই। গরুর পাকস্থলীটা চারভাগে ভাগ করা। গরু কোন কিছু খাবার পর খাবারটা পাকস্থলীর 'পাউচ্' বা ১নং অংশে হাজির হয়, সেখানে খানিকটা নরম হবার পর সেটা যায় পাকস্থলীর ২নং অংশে। পাকস্থলীর এই দুটি অংশ থেকে গরু ইচ্ছামত তার খাওয়া-খাবারটা

মুখে এনে হাজির করতে পারে। এই ভাবে মুখে খাবার ফিরিয়ে এনে সে আবার চিবিয়ে সেটাকে গিলে ফেলে, তখন খাবারটা প্রথমে পৌঁছায় পাকস্থলীর ৩নং অংশটিতে, সেখান থেকে তারপর যায় পাকস্থলীর ৪নং অংশে। সেখানে খাবারটা পুরোপুরি হজম হয়ে যায়। শুধু গরু নয়, যে সব জানোয়ারের পায়ের ক্ষুর দু'ভাগে চেরা তারাই জাবর কাটে, এটাও জেনে রেখো।

গরু ঘাস, খড়, খোল খায়—কিন্তু তাই থেকে দুধ হয় কি করে?

প্রশ্নটা সোজা হ'লেও জবাবটা খুব সোজা নয়। জেনে রাখো, ঘাস খড়ের থেকেই দুধ তৈরী হয় না। সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের দেহে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডস (Glands) আছে। এই সব গ্রন্থির কতকগুলির কাজই হলো শরীরের রক্তপ্রবাহ থেকে জল ও অন্যান্য জিনিষ টেনে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের লালা বা রস (Secretion) তৈরী ক'রে শরীরের নানা কাজে লাগান; আগেই যেমন পড়েছ চোখের গ্ল্যাণ্ড অশ্রুগ্রন্থির কাজ হলো চোখের জল তৈরী করা, থুথু বা লালা তৈরী করে জিভের স্বাদগ্রন্থিগুলো—তেমনি ঐ দুধও জীববিশেষের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির সাহায্যে তাদের দেহের রক্ত থেকেই তৈরী হয়। দুধটা জীবমাত্রের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী খাদ্য হিসাবে তৈরী হয়।

কুকুরগুলো রাত্রিবেলায় বেয়াড়া সুর ক'রে ডাকে কেন?

পশুবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কুকুরের পূর্ব্বপুরুষেরা আদিকালে শেয়ালের মত দল বেঁধেই জঙ্গলে বাস করতো। শেয়ালরা যেমন দল বেঁধে রাত্রিবেলা হুক্কা হুক্কা ডাক ডেকে তাদের জাত ভাইদের জড়ো করে, কুকুররাও সেকালে অমনি করে রাত্রিবেলায় জাতভাইদের ডেকে এক দলে জড়ো করতো। প্রাচীন কালের সেই স্বভাবটি এখনও তারা ষোলআনা ভুলতে পারেনি বলেই অমনি বেয়াড়া সুরে রাতের বেলায় ডাক ছেড়ে তাদের দলবলকে দলে ডেকে নেবার চেষ্টা করে।

গরুর মত চিবিয়ে না খেয়ে কুকুর গিলে খায় কেন ?

গরু চিবিয়ে বা জাবর কেটে যেমন করে খায়, কুকুর তেমনি ক'রে না খেয়ে কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলে খায় এইজন্যে যে, কুকুরের মুখে চিবোবার উপযোগী কষের দাঁতও নেই ; আর জাবর কাটার ব্যবস্থাও নেই।

বিড়ালকে উঁচু থেকে ফেলে দিলে আঘাত পায় না কেন ?

এই জন্যে যে প্রকৃতি তার শরীরের গড়ন আর ওজন এমনভাবে তৈরী করে দিয়েছেন যে, সে যখনই ওপর থেকে পড়বে, তখনই তার চারটি পায়ের থাবার ওপর ভর করেই পড়বে, যার ফলে তার শরীরে চোট লাগবে না। এ ব্যবস্থা প্রকৃতি করেছেন এই জন্যে যে, বিড়ালকে তার খাবার-দাবার সংগ্রহ করবার জন্যে আনাচে-কানাচে, কার্নিশে বা গাছের ডালের মত বিপজ্জনক উঁচু জায়গা দিয়ে চলাফেরা করতে হয় ব'লে। ঐসব জায়গা থেকে পা পিছলে পড়বার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে কাজেই ওভাবে প্রকৃতি তাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছেন।

মাছকে খাবার দিলে চিবিয়ে না খেয়ে গিলে খায় কেন ?

তার কারণ মাছদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্য অনবরতই মুখ খুলতে আর বন্ধ করতে হয়। বেচারার বেশীক্ষণ মুখ বন্ধ ক'রে থাকবার উপায় নেই, তাই তাকে খাবারটা টপ্ ক'রে গিলে খেতে হয়। গিলে না খেলে, মুখ খুললেই খাবার বেরিয়ে যায় মুখ থেকে।

জলের তলায় মাছেরা সহজেই বাস করে, অথচ আমরা বাস করতে পারি না কেন ?

এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, স্থলচর জীব মাত্রেই বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে। অথচ জলচর জীবেরা বেঁচে থাকে জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে। এই অক্সিজেন নেবার জন্যেই শ্বাস-যন্ত্রের দরকার। মাছদের জল থেকে অক্সিজেন নিতে হয় ব'লে তাদের শ্বাস-যন্ত্রটা ঠিক স্থলচর জীবদের মত নয় এবং স্থলচর জীবের শ্বাস-যন্ত্র জলের থেকে অক্সিজেন নেবার মত ক'রে

তৈরী নয়; কাজেই স্থলচর জীবমাত্রেই যেমন জলের তলায় ডুবে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি মাছেরাও ডাঙ্গায় উঠে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। তবে কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি কোনও কোনও জাতের মাছ ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, এর কারণ তাদের দেহে জলের তলা থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ব্যবস্থাও যেমন আছে, তেমনি আবার ডাঙায় উঠে অক্সিজেন নিয়ে খানিকক্ষণ বেঁচে থাকবার উপযোগী ফুসফুসও আছে। মাছের নাকের ছেঁদা আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা আমাদের মত নিশ্বাস নেয়না, এও জেনে রেখো।

চিংড়ীমাছের শরীরে শিরা, উপশিরা, হাড় ও রক্তের সন্ধান মেলে না, তবে ওরা কি ক'রে বাঁচে? চিংড়ীমাছের দেহ চালাবার যন্ত্রটি তার শরীরের কোন্ স্থানটিতে আছে?

বেঁচে থাকতে হ'লে শিরা, উপশিরা, হাড়, মাংস, রক্ত থাকা চাই-ই, এমন ধারণা তোমাদের হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু জেনে রেখো, জীব-জগৎটা বিরাট এবং এই জীব-জগতে অণু পরমাণু থেকে সুরু ক'রে মানুষ পর্য্যন্ত কোটি কোটি রকমের জীব আছে এবং তাদের দেহ ও শরীরের গড়ন অনুযায়ী তারা আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা। চিংড়ীমাছ অতি নিম্নস্তরের জীব, তারা যে শ্রেণীতে পড়ে তাদের বলা হয় 'আন্নালুসা' (Annalusa)। এই শ্রেণীর জীবদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের শরীর আঙটির মতো টুক্‌রো টুক্‌রো কতকগুলো অংশের সমষ্টিতেই তৈরী হয় এবং এদের দেহে রক্ত থাকে না। চিংড়ীমাছের শরীর চালাবার যন্ত্রটা আসলে থাকে তার মাথার খোলের ঐ অংশটার ভিতরেই; ঐখানেই আছে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির অন্যান্য যন্ত্র—ঐ অংশটিকে ইংরাজীতে বলে 'কারাপেস্' (Carapace)।

হাঁস বা পানকৌড়ীর পালখ জলে ভেজে না কেন?

হাঁস বা পানকৌড়ীর পালখ জলে ভেজে না তার কারণ এদের শরীরে ল্যাজের দিকে 'তৈলগ্রান্থ' বলে এক ধরণের 'গ্ল্যাণ্ড' আছে—সেখান থেকে

চর্ব্বি বা তেলজাতীয় পদার্থ বার হয়ে প্লালকগুলিকে সব সময়ে তৈলাক্ত বা 'তেলা' করে রাখে।

জোনাকী-পোকারা রাতে জ্বলে কেন ?

জোনাকী পোকার গায়ে যে জিনিসটা আগুনের মত জ্বলে, ওটা মোটেই আগুন নয়, ওতে কোন তাপ নেই ; জোনাকীর দেহের ভেতরে কয়েকটা প্রক্রিয়ার ফলে ঐ আভা দেখা যায়। দিনের আলোয় সেই আভা দেখা যায় না, অন্ধকারেই সেটা ফুটে ওঠে। তবে দিনের বেলাতে ঘর অন্ধকার ক'রে যদি জোনাকী পোকা ছেড়ে দাও, তাহ'লেও আলো দেখতে পাবে।

মাছের পটকা কি কাজে লাগে ?

এর জবাব, মাছের ঐ পটকার ভেতরে বায়ু বা গ্যাস ভর্ত্তি থাকাতেই মাছ জলে ভাসতে পারে। সব জাতের মাছের পটকা 'বায়ুথলি' সমান নয়। যে সমস্ত জাতের মাছ গভীর জলে থাকে, তাদের পটকা খুব ছোট হয় বা কোনও কোনও জাতের মাছের একদম পটকা থাকেই না। যে সব মাছের পটকা বড়, তারা খুব বেশী জলের নীচে যেতে পারে না।

সাপ-ব্যাঙ শীতকালে যখন গর্ত্তের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে, তখন তারা কি খায় ?

তারা তখন কিছু খায় না। কারণ, তখন তাদের খাবারের দরকারও হয় না। সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েকটি জীবের শীতকালে এই যে 'ঘুমন্ত' বা জড় অবস্থা, একে ইংরেজীতে বলে "Hibernation"। এই Hibernation-এর ব্যবস্থা আছে শুধু কতকগুলো 'ঠাণ্ডারক্ত-ওয়ালা' জীবের শরীরে ; অর্থাৎ তাদের রক্তের কোন স্থায়ী উত্তাপ নেই, মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর মত। এই ঠাণ্ডারক্ত-ওয়ালা জীবজন্তুর রক্তের উত্তাপ বাইরের আবহাওয়ার উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে কমে। কাজেই শীতে তারা আমাদের মত কাবু হ'য়ে যাতে না পড়ে, সেই ব্যবস্থায় শীতের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টা না ক'রে দেহের সমস্ত কলকজা বন্ধ ক'রে রেখে শীতের হাতেই আত্মসমর্পণ

করে। কাজ ক'রলেই শরীরের ক্ষয় এবং সে ক্ষতি মেটাতেই আমাদের খাদ্যের দরকার। কাজেই Hibernation অবস্থাকে অনায়াসেই বলা চলতে পারে যে, না-খেয়ে বেঁচে থাকবার সোজা উপায়। আমরাও যদি কাজ না ক'রে দিন রাত্তির ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমাদেরও খাবারের প্রয়োজনটা অনেক কম বোধ হয়।

কোন্ পাখীর ডিম সবচেয়ে বড় ?

বর্ত্তমান যুগে যত রকম পাখী দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে উটপাখীর ডিম সবচেয়ে বড়। কিন্তু যে সব পাখী লোপ পেয়েছে, তার মধ্যে নিউ-জিল্যাণ্ডের মোয়াস (Moas) পাখীর ডিম হতো এক ফুট লম্বা।

যে সমস্ত জীব ডিম পাড়ে, তারা একসঙ্গে কতগুলি পর্য্যন্ত পাড়ে ?

অণ্ডজ প্রাণীরা ১ থেকে ৮,০০,০০০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে এক সঙ্গে। সমস্ত জীবের ডিম পাড়ার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি জেনে রেখো—হাঁস বা মুরগি ১টি ক'রে ডিম পাড়ে এক পক্ষকাল ধরে। কুমির একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫টি ডিম পাড়ে। সাপ ২০।২৫টি, কচ্ছপ ৫০টি, কড মাছ এক একবারে ১০ লক্ষ ডিম পাড়ে। শামুক ৫০টি, উইপোকা একসঙ্গে ৮,০০,০০০ ডিম পাড়ে।

উট খাবার এবং জল না খেয়ে কি ক'রে অনেকদিন বাঁচে ?

উট অনাহারে অনেক দিন থাকতে পারে এইজন্য যে, তার পিঠের ওপর যে কুঁজটি দেখো, সেটাতে থাকে একরকম চর্ব্বি জমানো, খাবারের অভাব যখন ঘটে, তখন তার ঐ কুঁজের চর্ব্বি তার শরীরকে পুষ্ট করে ঐ কুঁজ থেকে খাবারের মতই শক্তি যুগিয়ে। পণ্ডিতেরা দেখেছেন যে, উটকে অনেকদিন না খেতে দিয়ে রাখলে, তার কুঁজটি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে ও হেলে পড়ে, কেননা তখন তার চর্ব্বির ভাগটা কমতে থাকে।

আর উট জল না খেয়ে থাকতে পারে, তার কারণ হচ্ছে উটের পেটের মধ্যে তার পাকস্থলীর চারধারে জল জমিয়ে রাখার উপযোগী বহু থলি আছে। সে যখন জল খায়, তার তেষ্টা মেটাবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু

খেয়ে নিয়ে ঐ বাকিটুকু সেই সমস্ত থলিতে জমিয়ে রাখে এবং তাকে যখন জলহীন মরুভূমির মধ্যে চলতে হয়, তখন ঐ সমস্ত থলি থেকে জল টেনে নিয়ে শরীরই তার জলের অভাব মেটায়, কাজেই তেষ্টায় সে অধীর হয়ে ওঠে না আমাদের মতো।

মশা মাছি ও ঝিঁঝিঁপোকা যে ডাকে, তার শব্দটা কি ?

মশা মাছির ডাকটা আসলে তাদের ডাক বা মুখের শব্দ নয়, ওটা তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শব্দ। মশার ডানার নীচে একজোড়া ডাম্বেলের মত একরকম প্রত্যঙ্গ আছে, সেখানে মশার ডানার আঘাত লেগে ঐ রকম ভন্ ভন্ শব্দের সৃষ্টি করে। মাছিদের পায়ে ডানার আঘাত লেগে ভন্ ভন্ শব্দের সৃষ্টি হয়। ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ-ঝিঁ শব্দটা হয় তাদের পায়ে পা ঘষার শব্দ থেকেই, ঠিক যেমন বেহালাতে বেহালার ছড়ি ঘষলে শব্দ হয়, তেমনি কাণ্ডই ঘটে ওদের পায়ে পা ঘষা লেগে—আমরা তাই শুনি ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের আকারে।

মৌমাছি মধু কোথায় পায় ?

মৌমাছি ফুল থেকে Nectar বা মধুরেণু সংগ্রহ করে তার লম্বা শিশি-বোতল-ধোওয়া বুরুশের মত জিভ দিয়ে এবং তারপর ঐ জিভের শোষক নল দিয়ে মুখে টেনে নেয় ঐ মধুরেণু, সেখান থেকে তা যায় মৌমাছির পেটের ভিতরের মধুথলিতে, সেখানের অম্লরসের সংস্পর্শে এসে ঐ মধুরেণু বিশুদ্ধ মধুতে পরিণত হয়।

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় কেন ?

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় এইজন্য যে, অন্য জন্তুর মত তার দেহের লোমে তৈলাক্ত কোনও পদার্থ নেই অর্থাৎ সেটা জল-নিরোধক (water-proof) নয়। কাজেই অন্যান্য জন্তুর মত গায়ের জল তারা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। জলে তারা ভিজে যায়, এই ভিজে যাওয়ার ফলে তাদের বড় শীত করে বা কষ্ট হয়। তাই তারা জল দেখলে ভয় পায়। শীতকালে যে

কারণে তোমরা কন্‌কনে জলকে ভয় করো, অনেকটা সেই কারণেই বিড়াল জলকে ভয় করে।

কোন্ জীব চোখ না বুজেই ঘুমোয়?

মাছ চোখ না বুজেই ঘুমোয়, কারণ তার চোখের ওপরে জীবজন্তু বা মানুষের চোখের মতো চোখের পাতা নেই। এই জন্যে অনেকে বলেন—মাছ ঘুমোয় না।

কোন্ জীব ডাকতে পারে না?

জিরাফের দেহটি দেখেছ তো কত বড়। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, জিরাফ নাকি একেবারেই ডাকতে পারে না।

কোন্ জীবের দৃষ্টিশক্তি নেই?

কেঁচো, উইপোকা এদের কোনটিরই দৃষ্টিশক্তি নেই।

কোন্ জীবের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে বেশী?

জীব-জগতে পাখীদের দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য জীবের চেয়ে বেশী, কারণ পাখীদের চোখে ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মত শক্ত রিং আছে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য। ঈগল, প্যাঁচা, শকুন তাই বহুদূর থেকে দেখতে পায়।

কোন্ পাখী উড়তে পারে না?

উটপাখী, এমু এবং কিউই পাখী উড়তে পারে না।

সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে কোন্ জীব?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে মাছি; মাছির গতির কাছে আর সবাই হার মানে। মাছি ঘণ্টায় ৫১০ থেকে ৬০০ মাইল বেগে যায়। পাখীদের মধ্যে বাজপাখী আর ঈগল সবচেয়ে দ্রুত যেতে পারে, তারা ঘণ্টায় ১৭০ থেকে ১৮০ মাইল পর্য্যন্ত যায়। স্থলচর জীবদের মধ্যে চিতাবাঘ সবচেয়ে দ্রুতগামী জীব, তারা ঘণ্টায় ৬০ মাইল যায়। আর মাছদের মধ্যে টান্নি মাছ যেতে পারে ৬০ মাইল বেগে।

জীব-জগতে কোন্ জীব সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে ?

সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে তিমি মাছ, এরা তিনশো বছরের বেশী বাঁচে। এছাড়া কচ্ছপ, কুমির, হাতী এদেরও পরমায়ু কম নয়।

সবচেয়ে বড় আকারের পোকা-মাকড় কি ?

সবচেয়ে বড় আকারের পতঙ্গ হচ্ছে এরিবাস এগ্রিপপিনা (Arebas Agrippina)। এর ডানাসুদ্ধ মাপ হচ্ছে ১১ ইঞ্চি। আর ডানা বাদ দিয়ে সবচেয়ে বড় আকারের দেহ যদি ধরা হয়, তাহ'লে সবচেয়ে বড় পোকা—'ম্যাক্রোডন্টিয়া সারভিণ্টর্নিস' ব'লে গুব্‌রে জাতের পোকা। এটির দেহ লম্বায় ৬ ইঞ্চি মাপের হয়।

আকাশের রাজত্বের খবর

আকাশ কি ?

আকাশ হলো পৃথিবীর বাইরের শূন্যতা; কিন্তু এই শূন্যতাই আবার বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা আছে। সমুদ্রের জলের সমতার (Sea-level) ঠিক ওপর থেকে সুরু হলো বায়ুস্তর অর্থাৎ বাতাসে ভর্ত্তি এই স্তর; বায়ুস্তরের নীচের দিককে বলা হয় 'ট্রপোস্ফিয়ার' (Troposphere)। ওপরের স্তরকে বলা হয় 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার' (Stratosphere)। এই ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার আমাদের মাথার ১০ মাইল ওপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার ওপরে ২০।২২ মাইল উঁচুতে 'ওজোনোস্ফিয়ার' (Ozonosphere); এই বায়ুস্তরে আছে ওজোন (Ozone) গ্যাস। তার ওপরে হচ্ছে 'আয়োনোস্ফিয়ার' (Ionosphere); এখানে আছে বিদ্যুৎ-অণু।

চাঁদের ভেতরের চরকা-বুড়ী কে ?

চাঁদের ভেতর গাছের তলায় ব'সে বুড়ী চড়কা কাটছে ব'লে যে জিনিসটা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছ, ওটা সত্যি সত্যি চাঁদের মা বুড়ী নয়; ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীর মত চাঁদেও মেলাই পাহাড়, পর্ব্বত, গর্ত্ত, খোন্দল এই সব আছে, তাই সব জায়গায় সমানভাবে সূর্য্যের আলো পড়ে না। আর তাই চাঁদের ঐ জায়গাগুলোতে আলোছায়ার সমাবেশে অদ্ভুত যত ছায়াছবির সৃষ্টি হয়।

সূর্য্য পশ্চিম দিকে না উঠে রোজই পূর্ব্ব দিকে ওঠে কেন ?

সূর্য্য পশ্চিমদিকে ওঠে না এইজন্য যে, পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডকে ভর ক'রে অহরহ পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকেই ঘুরছে।

সূর্য্যের আলোর এত উত্তাপ কেন ? সূর্য্যটা কত গরম ?

সূর্য্য হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড, চারধারে তার রয়েছে জলন্ত গ্যাস—এই গ্যাস ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে বলেই আলো আর উত্তাপ পাই আমরা। সূর্য্যের উপরিভাগের উত্তাপের মাপটা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—ছ'হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

রামধনু কি ?

আকাশে যে মেঘ থাকে, সেগুলোতে থাকে অসংখ্য জলবিন্দু—সেই জলবিন্দুগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্য্যের আলো যখন সোজা যেতে যেতে ঠেক খেয়ে বেঁকে পৃথিবীতে পড়ে তখন তাকে বলে সূর্য্যরশ্মির বক্রণ বা 'রিফ্রাক্সন' (Refraction); তখনই সূর্য্যের আলোয় লুকানো সাতটি রঙকে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথিবী থেকে দেখা যায়—এই যে রঙের সমাবেশ এটি হলো রামধনু। সময় সময় আলাদা আলাদা দুটি বিভিন্ন কোণে (angle) আলো বেঁকে পড়ার দরুণ দুটি রামধনুও দেখা যায়।

রামধনু অমন ধনুকের মত গোল হয় কেন ?

রামধনু যখন দেখা যায়, তখন সূর্য্য ৪৫° ডিগ্রী কোণে হেলে থাকে। ঐ অবস্থায় আলোক-রশ্মি বৃষ্টিকণায় প্রতিফলিত হয়ে যে ভাবে 'রিফ্র্যাক্টেড' (Refracted) হয় বা আলোকরেখার গতিপথ যেভাবে বেঁকে যায় তাতে বৃষ্টিকণায় আলোর প্রতিফলন গোল হয়েই হয়। তাই রামধনু গোল দেখায় সূর্য্য ৪৫° ডিগ্রী কোণে থাকলেই 'রামধনু' দেখা সম্ভব, তা নইলে নয়।

যেখানেই যাও, সূর্য্য আর চাঁদ সেখানেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় কেন ?

সূর্য্য মামা আর চাঁদা মামা ভাগনেদের ভালবাসেন বলেই ঐ কর্ম্মটি করেন, এটা যেন মনে করোনা। সূর্য্য আর চাঁদ—গোল পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে রয়েছে বহুদূরে, কাজেই পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই তাদের দেখা যায় আর ব্যাপারটা তাই অমন মনে হয়।

সূর্য্যকে উদয় এবং অস্তের সময় লাল দেখায় কেন ?

তার কারণ তখন পৃথিবীর ওপরের বায়ুস্তর ভেদ ক'রে সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীতে সোজাসুজি পড়ে না। উদয় ও অস্তের সূর্য্য Horizon বা দিকচক্রবালের নীচে চলে যায় এবং তার ফলে বায়ুস্তরের উপর সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলন এমন একটা কোণ বা angle থেকে বাঁকা ভাবে হয়, যার ফলে সূর্য্য ওঠার সময় আমাদের চোখে সূর্য্যকে বড় দেখায়। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যখন পূর্ব্ব দিকে ওঠে এই একই কারণে তাকেও মস্ত বড় দেখায়। সূর্য্যকে ওঠবার সময় লাল দেখায় এইজন্য যে, ঐভাবে সূর্য্য নীচে থাকায় তার নীল বা বেগুনে আলোকরশ্মি ছোট ছোট আলোক তরঙ্গে গঠিত ব'লে তখন বাতাসের ধূলিজাল ও জলকণা ভেদ ক'রে ঐ পথে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয় না ; কিন্তু 'কমলা' ও লাল রঙের আলোক-রশ্মিগুলো দীর্ঘ আলোক-তরঙ্গে গঠিত বলেই সেগুলো বায়ুমণ্ডলের নীচের গভীর

স্তর ভেদ ক'রে চোখে পড়ে, তাই তখন সূর্য্যকে লাল দেখায়। আকাশে ধুলো থাকলে ঐ সময়ে নানা রকম রঙ-এর খেলাও ঐ কারণে দেখা যায়।

মঙ্গলগ্রহে লোক আছে নাকি ?

মঙ্গলগ্রহে লোক আছে কিনা বলা যায় না, সেখানে হয়ত অন্য কোনও ধরণের জীব আছে, এটা বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই আন্দাজ করেন, তবে এখনও তা যথারীতি প্রমাণিত হয় নি।

আকাশ নীল দেখায় কেন ?

আকাশ নীল দেখায়—কারণ, সূর্য্যরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ ক'রে পৃথিবীতে আসে, কিন্তু সূর্য্যরশ্মি এই বায়ুস্তর ভেদ করার আগেই, বায়ুস্তর তার ওপরের হাইড্রোজেন গ্যাস এবং তড়িৎঅণু (Electron) মেশানো সূর্য্যরশ্মি থেকে খানিকটা নীল রঙের আলো শুষে নিয়ে পৃথিবীর চারধারে ছড়িয়ে দেয়, তাই আকাশ নীল দেখায়। কেউ কেউ বলেন, সূর্য্যের আলো হাওয়ার ভেতর দিয়ে আসবার সময় হাওয়ায় ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণা ও অণুতে ঘা খেয়ে ছোট ছোট আলোক-তরঙ্গ থেকেই নীল আলোর উৎপত্তি হয়, কাজেই আকাশ অমন নীল। সূর্য্যরশ্মির ভেতর সাতটা রঙ লুকানো আছে তা বোধ হয় তোমরা জানো এবং এই সাতটা রঙ-এর সৃষ্টি হয় ছোট বড় বিভিন্ন মাপের আলোক-তরঙ্গ থেকেই।

চন্দ্র ও সূর্য্যের চারিদিকে সময় সময় গোলাকার যে চিহ্ন পড়ে সেটা চন্দ্র-সূর্য্যের সভা কিনা—আর অমন দেখায় কেন ?

চন্দ্র সূর্য্যের চারধারে ঐ যে গোল আলোর বেড় সময় সময় দেখা যায়, ওকে আমাদের দেশে চন্দ্র-সূর্য্যের সভাই বলা হয় বটে, তবে ইংরেজীতে ওকে বলা হয় হ্যালো (Halo)। বায়ুমণ্ডলীর খুব উপরের স্তরের জলকণা বা তুষারকণায় সূর্য্য বা চন্দ্রের আলো প্রতিফলিত হয়েই ওই জিনিসটার সৃষ্টি হয়—ঠিক যেমন ক'রে বায়ুমণ্ডলীর জলকণাপূর্ণ স্তরে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

দিনের বেলায় আমরা তারা দেখতে পাইনা কেন ?

এর কারণ দিনের বেলায় প্রখর সূর্য্যরশ্মি আমাদের চারপাশের বায়ু-মণ্ডলীতে ছড়িয়ে থাকে। সেই আলো ভেদ ক'রে বহু দূরের তারার মৃদু আলো তখন আমাদের চোখে প্রতিফলিত হ'তে পারে না, তাই আমরা দিনের বেলায় তারা দেখতে পাই না। তবে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্য ঢাকা পড়ে, তখন চারধারে অন্ধকার হ'য়ে পড়ে, তখন দিনের বেলাতেও সময় সময় তারা দেখা যায়। কাজেই তারারা রাতেও যেখানে থাকে দিনেও ঠিক সেইখানে থাকে।

আকাশে কত তারা আছে ?

সেটা বলা বড়ই শক্ত। কারণ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে মহাশূন্যে। তবে বিজ্ঞানীরা গুণে ব'লেছেন, পৃথিবীর ওপর থেকে শুধু চোখে যে ক'টি তারা দেখা যায় তার সংখ্যা হচ্ছে ৭,৬৪৭ সাত হাজার ছ'শো সাতচল্লিশ। কাজেই তুমি অনায়াসে অন্ধকার রাত্তিরে গোটা আকাশটার দিকে তাকিয়ে নির্ভুল ভাবে ব'লতে পার—"আমি তিন হাজারের কিছু বেশী তারা দেখতে পাচ্ছি।" আর পৃথিবীর ওপিঠের লোকগুলো দেখছে বাকী সব তারা। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা ?

চাঁদের নিজস্ব কোন উত্তাপ আছে ?

চাঁদের নিজস্ব কোন তাপ নেই, তবে সূর্য্যের তাপে সে গরম হয়ে ওঠে। আবার চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী যখন সূর্য্যের আলোর পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়ায় তখন সে হয় ঠাণ্ডা।

সূর্য্যের আলোয় সাতটা রঙ লুকানো আছে নাকি ?

সূর্য্যের কিরণে যে সাতটা রঙ আছে তা সহজেই যদি বুঝতে চাও তাহ'লে পুরানো ঝাড় লণ্ঠনের একটা তেশিরে বা তিন-কোণা কাচ যোগাড় ক'রে তার ভেতর দিয়ে রোদ্দুরটাকে দেখ। নয়তো আর এক কাজ করতে পার, এক মুখ জল নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে খুব জোরে ফুঁ দিয়ে ছুঁড়ে দেবে, দেখবে

তাতেও সাতটা রঙ। কারণ সূর্য্যের আলোর সাতটা রঙ তখন ঐ জলকণায় প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়।

মেঘ করলে গরম আর গুমোট হয় কেন?

মেঘ করলে গরম আর গুমোট হয় এই জন্য যে, মেঘেরা বাতাসের পথ আটকে ঘোরাফেরা করে আকাশে। তাতেই আমাদের চারিপাশের বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। কাজে কাজেই পৃথিবীর ভেতর থেকে সব সময়েই যে উত্তাপ আসছে, সেও মেঘের চাপ ভেদ ক'রে ওপর দিকে যেতে না পেরে আমাদের চারপাশের আবহাওয়াকে গরম ক'রে তোলে।

পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় রাত্রের মত অন্ধকার হয় না কেন?

আসলে চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে অনেকটা তফাৎ। চন্দ্রগ্রহণ হয় তখনই, যখন পৃথিবীর কালো ছায়াটা চাঁদে এসে পড়ে বলেই চাঁদকে কালো দেখায়; কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ যখন হয় তখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে সোজাসুজি এসে পড়ে চাঁদ এবং সূর্য্যগ্রহণের সময় যে কালো জিনিসটি দেখতে পাও সেটা চাঁদই, সূর্য্যের ওপর চাঁদের ছায়া নয়। সূর্য্যের আলো পেছনে থাকার ফলের চাঁদকে অমন কালো দেখায় এবং এইজন্য রাত্রের মত অন্ধকার হয় না। তার পাশ থেকে যেটুকু সূর্য্যরশ্মি আকাশে ছড়ায় তারই আলোতে অমন কালো মেঘলা দেখায়।

মেঘেরা আকাশে নড়ে চড়ে কেমন করে? অমন ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলায় কেমন ক'রে?

মেঘটা আসলে হচ্ছে কোটি কোটি হাল্কা জলকণা, ধোঁয়া, ধুলো ও তুষার-কণার সমষ্টি—হাওয়ার চেয়ে হাল্কা বলেই বাতাসে ভর ক'রে ওরা অমনি আকাশে ভেসে বেড়ায়। আর বাতাসের চাপ লেগেই মেঘ চেহারা বদলে বদলে কখনও হাতী, কখনও উট, কখনও পাহাড়, কখনও বা গাছের মতই রূপ ধরে।

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের মধ্যে প্রভেদ কি?

প্রথমে বলি সূর্য্য ও নক্ষত্রের মধ্যে বড় বিশেষ তফাৎ নেই, কারণ নক্ষত্র গুলো আসলে সূর্য্যের মতই জলন্ত গ্যাসের গোলা এবং ছোট খাটো এক একটি সূর্য্য তবে তারা অনেক দূরে থাকে বলেই অত ছোট দেখায়। কাজেই নক্ষত্র কারুর কাছ থেকে আলো ধার করে না—আলোটা তাদের নিজস্ব। তবে গ্রহগুলোর নিজস্ব কোন আলো নেই। তাদের দেহে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার ফলেই অমন জ্বলজ্বলে দেখায়। চন্দ্র কিন্তু গ্রহও নয়, নক্ষত্রও নয়—একে বলা হয় 'উপগ্রহ'; কারণ পৃথিবীর চারপাশে চন্দ্র ঘুরছে, এরকম বহু উপগ্রহ বিভিন্ন গ্রহের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়?

পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্য অনেক বড়, কত বড়ো জানো? পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বড়। অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৩০ হাজার পৃথিবী এক করলে তবে একটি সূর্য্যের সমান হবে। অমন দূরে আছে ব'লে অত ছোট দেখায়।

পৃথিবী থেকে চাঁদ কতদূরে আছে? চাঁদের মাপ কত?

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের কোন বাঁধা-ধরা মাপ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, চাঁদ পৃথিবীর চারধারে যে পথে ঘুরছে সেটা ঠিক গোল নয়, কাজেই চাঁদের গড়পড়তায় দূরত্বের মাপ হচ্ছে পৃথিবী থেকে ২৩৮৮৪০ মাইল। চাঁদের মাপ হচ্ছে মোট ১৪৬৭৫০০০ বর্গ মাইল।

চাঁদে যে বাতাস আর জল নেই তার প্রমাণ কি?

প্যারিসের মিউডেন অবজারভেটারীর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চাঁদের আলো বাস্তবিক পক্ষে ঠিক ঐ আগ্নেয়গিরির ছাই-চাপা আগুন থেকে যে ধরণের আলো প্রতিফলিত হয়, সেই ধরণেরই আলো। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা এইটাই সম্ভব ব'লে ধরে নিয়েছেন যে, চাঁদ আগাগোড়া জ্বলন্ত আগুনের ওপর ছাই দিয়ে ঢাকা। যদি সেখানে হাওয়া থাকত তাহ'লে ঐ ভাবে ফাঁকা ছাই দিয়ে আগুন ঢাকা সম্ভব হ'ত না কখনই, বা ঐ ভাবে আগুন

নিভে নিভে ছাইও হয়ে যেত না। হাওয়ায় ছাই উড়ে গিয়ে আগুনই দেখা যেত। কাজেই সেখানে হাওয়া নেই, অতএব জলও নেই।

উল্কা জিনিসটা কি?

অনেকের ধারণা উল্কা হচ্ছে ছোট ছোট তারা, কিন্তু তা মোটেই নয়। উল্কা বললে বুঝতে হবে—কতকগুলো ধাতু ও প্রস্তরের মতো শক্ত পদার্থ যা তারার মতই সীমাহীন আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে তারা কখনও কখনও পৃথিবীর চারধারের বায়ুস্তরের মধ্যে এসে পড়ে। পৃথিবীর বাইরের এই বায়ুস্তরও ঠিক পৃথিবীর মতই সচল এবং সেইজন্যই উল্কাগুলো এই স্তরের সংস্রবে এসে পড়লেই তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়ে দেশলাইয়ের কাঠির মত দপ ক'রে জ্বলে ওঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধ'রে এই রকম কত লক্ষ লক্ষ উল্কা পৃথিবীর বায়ুস্তরের টানে পুড়ে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খুব বড় ধরণের উল্কা হ'লে সমস্তটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীর এলাকায় এসে পড়ে এবং তার আগুন নিভে গিয়ে বাকী অংশটুকু শক্ত একটা পিণ্ডের মত পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে।

সমুদ্রের ধারের দেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি বেশী হয়; কিন্তু সমুদ্রের ধারে থেকেও কতকগুলো দেশ মরুভূমি এর কারণ কি?

সমুদ্রের ধারে থেকেও সে-দেশগুলো মরুভূমি হয়েছে এইজন্যে যে, এই জায়গাগুলোর ওপর দিয়েই Trade wind বা 'গরম ঝড়' অনবরত আসা-যাওয়া করে। ফলে, ওই সব দেশের মাটি তো শুকিয়ে যায়ই, উপরন্তু ঐ ঝড় এলোমেলো ভাবে না ব'য়ে এক পথ ধ'রে একই ভাবে আসা-যাওয়া ক'রে যত রাজ্যের বালি ব'য়ে এনে ফেলে সেখানে। প্রাচীনকালে এই বাতাসে ভর ক'রে পালতোলা জাহাজে ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য আনানেওয়া হতো ব'লে ঐ 'ঝড়ো-হাওয়া'কে Trade wind বলে। মরুভূমির মাটি গরম হাওয়ায় বা ঐভাবে শুকিয়ে সব সময় গরম হ'য়ে থাকার ফলেই তার ওপরের বায়ুস্তরও

গরম থাকে, কাজেই সেখানে বৃষ্টি মাটিতে পৌঁছবার আগেই তা' ওপরের বায়ুস্তর শুষে নেয়, সে কথা তো আগেই বলেছি।

পৃথিবী থেকে সব চেয়ে কাছে কোন্ নক্ষত্র ও কোন্ গ্রহ?

'আল্‌ফা সেণ্টরী' (Alpha Centauri) এই নক্ষত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে—এটিকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধেই দেখা যায়। কত কাছে জানো? ২৫০ লক্ষ মাইলের পিছনে আরও সাতটা শূন্য বসালে যত হয় তত মাইল দূরে। এই নক্ষত্রটির তুলনায় সূর্য্য আমাদের বেশ কাছেই আছে বলা চলে, কারণ পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মোটে ৯২ কোটি থেকে ৯৫ কোটি মাইলের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকেরা কি ক'রে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহের দূরত্ব মেপে ঠিক করেন, সেটাও মোটামুটি জেনে রাখো। নিচলসেন ব'লে এক বৈজ্ঞানিক 'ইণ্টারফোরোমিটার' ব'লে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, এই যন্ত্রের সাহায্যেই আলোর গতি মেপে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব ঠিক করা হয়। সব কাছে যে গ্রহটি আছে সেটি নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ, নাম তার 1239 H. A., এটি নাকি পৃথিবীর মাটি থেকে চার হাজার মাইল দূরে আছে। এটি আবিষ্কার করেছেন ডক্টর কাল রেইনমুথ্।

নদীতে বান দেখা যায় কেন?

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নদী এবং সমুদ্রে বান দেখা যায়। 'বান' আসলে জোয়ার-ভাঁটারই রূপান্তর। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফোলে ও কমে এবং তাই নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে এ-কথা নিশ্চয়ই ভূগোলে পড়েছ। কিন্তু এই সাধারণ জোয়ার-ভাঁটা যখন ঘটে, তখন সূর্য্যের টানে উল্টো দিকেই থাকে চন্দ্রের টানের গতি। কিন্তু কখনও কখনও সূর্য্য আর চন্দ্র এক হয়ে একই দিকে টানে জলকে। তখনই নদীর জল ভয়ানক ভাবে ফুলে ওঠে এবং এই জল ফুলে ওঠার ব্যাপারটাকেই আমরা বলি 'বান-ডাকা'। মোটামুটি ব্যাপারটা হ'ল এই। সব নদীতে বান ডাকে

না. তার কারণ, এই 'বান-ডাকাটা' নির্ভর করে নদীর গভীরতার আর নদীতলের সমতার ওপর।

তারা মিটমিট করে কেন?

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তারার আলোক-তরঙ্গ বা Light Wave-এ আমাদের চারপাশের বাতাসের ঢেউ-এর কাঁপন লাগার ফলেই তারার আলো আমাদের চোখে ঐভাবে কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হয়; আর তাই মনে হয়, তারারা জ্বলছে আর নিভছে।

সূর্য্যের চারিধারে বেড় দিয়ে কত বেগে পৃথিবী ঘুরে আসছে?

পৃথিবী একদিনে ১৬,০০,০০০ মাইল ঘুরে আসে। মিনিটে ১,১০০ মাইল, আর প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো মাইল বেগে পৃথিবী সূর্য্যকে বেড় দিয়ে ঘুরছে। সূর্য্যকে বেড় দিয়ে এভাবে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর একটি বছর লাগে।

পৃথিবী ঘুরছে অথচ আমরা ছিটকে পড়ে যাই না কেন?

খুব সোজা কথায় এর জবাব হচ্ছে, পৃথিবীর 'মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি' মানুষ, জন্তু, ঘর-বাড়ী ও এই পৃথিবীর সব কিছু জিনিসকেই তার কেন্দ্রের দিকে টেনে রেখেছে এবং সেই টান পৃথিবীর ঐ 'ঘুরিয়ে ফেলার গতি বা বেগ' (Centrifugal force) এর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তা' ছাড়া, পৃথিবীর এই 'ঘুরিয়ে ফেলার গতি' Centrifugal force আর 'মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি'র একটা সমতা সব সময়েই বজায় আছে এবং পৃথিবী একতালে একই ভাবে ঘুরছে, যার ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না; তবে যদি পৃথিবীটা কোনও দিন একটু বেশী জোরে ঘুরে ওঠে বা ঘোরার বেগটা একটু কমিয়ে ফেলে তা' হ'লে আমরা যে মহাশূন্যে ছিটকে পড়বো, তাতে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীটার ওজন কত?

পৃথিবীর ওজন সব প্রথম বার করেন হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস্। কিন্তু পৃথিবীর ওজন নতুন ক'রে যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম ডক্টর পল. আর. হেল্

—তাঁর হিসাবে পৃথিবীর ওজন হচ্ছে ৫৯৯৭ এই চারিটি সংখ্যার পর ১৮টি শূন্য বসালে যত হয় তত টন।

ধূমকেতু কি ?

সূর্য্যকে বেড় দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র যেমন সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরছে—তেমনি এক ধরনের জ্যোতিষ্কও সূর্য্যের চারধারে ঘুরছে। এই সব জ্যোতিষ্ককে দেখলে মনে হয় ধোঁয়ায় ঘেরা হয়ে বেড়াচ্ছে—তাই এদের নাম ধূমকেতু। আর মনে হয় আলোকরেখায় গড়া এদের একটা ক'রে লেজও আছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি এক একটি অগঠিত তারা। 'ধূমকেতু' বিভিন্ন রকমের আছে এবং এদের চলার গতি ও গতিপথের মাপ বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন 'ধূমকেতু' পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিপথে আসে তাদের ঘোরার গতি ও গতি-পথের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে। মোটামুটি এই সব ধূমকেতু সওয়া তিন বছর থেকে ৮০ বছর অন্তর এক একবার দেখা দেয়। কোনও কোনও 'ধূমকেতু'র দেখা হয়তো লক্ষ বছরে একবার পাওয়া যায়, এমন কথাও জ্যোতিষীরা বলেন। হেলির ধূমকেতু (Halley's comet) ৭৬ বছর অন্তর দেখা দেয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'হেলি' (Halley) এই ধূমকেতু আবিষ্কার করেন—তিনিই হিসাব ক'রে বলেছিলেন 'ধূমকেতু' ৭৬ বছর অন্তর দেখা দেবে।

'নীহারিকা' কি ?

অন্ধকার রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ধোঁয়ার মত জ্যোতিষ্ক দেখা যায় আকাশের গায়ে—তারই সাধারণ নাম নীহারিকা (Nebula); কিন্তু এ ধরনের সবগুলিই যে আসল নীহারিকা তা নয়। অনেক সময় ছোট ছোট তারার গুচ্ছকেও আমরা নীহারিকা ব'লে ভুল করি। আসল 'নীহারিকা' গুলোকে দূরবীন দিয়ে দেখলেও বাষ্পের আকারেই দেখা যায়। 'নীহারিকা' মাত্রেই হাল্কা গ্যাসে গড়া আলোকপুঞ্জ। জ্যোতির্বিদরা একাধিক নীহারিকা আবিষ্কার করেছেন।

পাতালের রাজত্বের খবর

পাতাল কি ?

হিন্দুদের মতে ত্রিলোক আছে—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। আকাশকে বলা হয় স্বর্গ। মর্ত্ত্য এই পৃথিবীটা, আর পাতাল হলো মাটীর নীচে। পুরাণের মতে পাতাল সাতটা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। যাক সে কথা, আধুনিক মতে পৃথিবীর গোটা দেহটা ধরতে হলে মাটির উপরের বায়ুস্তরকে বাদ দিলে চলে না; এবং পৃথিবীটা মোটামুটি ছ'টা এই রকম স্তরে ভাগ করা। প্রথমেই হলো বায়ুস্তর বা 'এ্যাটমস্ফিয়ার' (Atmosphere), তারপর হলো 'জলস্তর' বা 'হাইড্রোস্ফিয়ার' (Hydrosphere), তারপর 'অশ্মস্তর' বা 'লিথোস্ফিয়ার' (Lithosphere), তারপর আছে 'খনিজস্তর'; এর নীচে সব চেয়ে ব্যাপক এক স্তর—তাকে বলা হয় 'গুরুস্তর' বা 'ব্যারিস্ফিয়ার' (Barysphere); এর নীচেই পৃথিবীর 'কেন্দ্রস্তর' (Centrosphere)—এই কেন্দ্রস্তরটি বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্যাস অথবা জ্বলন্ত গলিত পদার্থে গড়া। 'পাতাল' বলতে আসলে বোঝায় ঐ লিথোস্ফিয়ার বা অশ্মস্তরের নীচের স্তরগুলি। 'লিথোস্ফিয়ার'-এর উপরে আছে সমুদ্র, সাগর, হ্রদ, মাঠ, বন, পাহাড়-পর্ব্বত। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ মাটির নীচে ও জলের নীচেটাকেও পাতাল ব'লে থাকি। পাতাল রাজত্ব কোথায় ও সেখানে কি আছে? পাতালের গভীর রাজত্ব বলতে তা'হলে বোঝাচ্ছে তিনটি স্তর—প্রথম হচ্ছে 'খনিজস্তর' (Ore zone), এই স্তর গঠিত হয়েছে মাটি আর খনিজ পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়ে। এর নীচেই যে 'গুরুস্তর' বা 'ব্যারিস্ফিয়ার'—সেই স্তরটি গঠিত হয়েছে লোহা ও নিকেল দিয়ে এবং সেইটিই পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত স্তর। তার জোরেই গোল পৃথিবী আমাদের সকলের, ঘরবাড়ীর ও পাহাড়-পর্ব্বতের ভার বইতে পারছে। এই স্তরের নীচেই আছে জ্বলন্ত গলিত পদার্থে গড়া

'কেন্দ্রস্তর' বা Centrospere। এই জ্বলন্ত গলিত পদার্থই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ ক'রে—আগ্নেয়গিরির ভেতর দিয়ে—একেই বলি আমরা অগ্ন্যুৎপাত।

জল ও মাটির নীচে কতদূর পর্য্যন্ত মানুষ সন্ধান পেয়েছে?

সাবমেরিণ চলেছে ৩৮৪ ফুট জলের নীচ দিয়ে, ডুবুরী নেমেছে ৮১৪ ফুট জলের নীচ পর্য্যন্ত। জলের নীচে 'ব্যারিস্ফিয়ার' বা 'জলগোলক' নামানো হয়েছে দেড় মাইল গভীরতা পর্য্যন্ত। মাটির নীচে মানুষ খনি খুঁড়েছে ৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত—তেলের খনি পৌছেছে ১০০০০ ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত। আর সমুদ্রের গভীরতার মাপ করেছে মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটের বেশী পর্য্যন্ত।

সুড়ঙ্গপথগুলো কি পাতালে যাবার রাস্তা?

না তা নয়। এগুলো দিয়ে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর বুকেই যাতায়াত করে। তবে মাটির নীচে ও জলের নীচে ঐ পথগুলো তৈরী হয়েছে ব'লে ওকে লোকে সাধারণতঃ বলে পাতালের পথ। এমনি ধারা তিনটি সুড়ঙ্গ রেল পথ আছে আল্পস্ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। একটি ৮ মাইল লম্বা—নাম তার "মণ্ট্ সেনিস্ সুড়ঙ্গ'—আরও একটা সুড়ঙ্গ আছে আল্পস্ পাহাড়ের ভেতর দিযে সেটা সওয়া নয় মাইল লম্বা—নাম তার 'সেণ্ট গটার্ড সুড়ঙ্গ'। আর বাকিটি হচ্ছে 'সিম্পলন্ সুড়ঙ্গ'—এটি সওয়া বার মাইল লম্বা—পৃথিবীর মধ্যে এইটি হলো মাটির ওপরে সব চেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ রেলপথ। জলের নীচে দিয়ে বিভিন্ন সুড়ঙ্গপথ বা টানেল আছে টেমস নদীর নীচে। লণ্ডন শহরের মাটির নীচে বহু সুড়ঙ্গপথ আছে—সেই সব সুড়ঙ্গ পথে 'টিউব রেলওয়ে' আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হলো মর্ডেন থেকে ইষ্ট ফিঞ্চলে পর্য্যন্ত ১৭॥ মাইল সুড়ঙ্গপথ।

পাতালের জীব কারা? তারা কেমন ক'রে কি খেয়ে বাঁচে?

সমুদ্রের গভীর জলের নীচে যে সমস্ত মাছ, পোকা-মাকড়, কীট, জলজন্তু থাকে তাদেরই আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি পাতালপুরীর বাসিন্দা। কিন্তু

সমুদ্রের জলের গভীরতাটাও বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জাতের জীবরা ঘুরে বেড়ায়, এটা জীবতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন। শুধু কি তাই? সমুদ্রের জলের তলায় হাজার হাজার মাইল নীচে ঐ লোনা জলেই বেড়ে উঠছে সামুদ্রিক গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল—ঠিক পৃথিবীর মাটিতে যেমন আমরা দেখতে পাই। মাটির ওপরে চারপাশের গাছ পাহাড় থেকে আমরা যেমন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে বেচে থাকি, সমুদ্রের তলার কোটি কোটি জীবও নিজের নিজের রুচি অনুসারে অমনি ঐ সব গাছপালা বা জলজ কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার খেয়ে বেঁচে আছে। সমুদ্রের তলায় ডুবুরীরা নেমে দেখে এসেছে সে এক মজার রহস্যপুরী, কত রঙ বেরঙের মাছ, কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জানোয়ার —যা হয়তো আমরা কোনও দিনই কেউ দেখতে পাব না।

সমুদ্রের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার কি ভাবে নেওয়া হয়?

এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে টেলিগ্রাফের যে তার জলের ভেতর দিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার ভেতর টেলিগ্রাফের শব্দ কি ক'রে শোনা সম্ভব, কারণ জলের তলায় তো বাতাস নেই? উত্তরটা খুব সোজা। টেলিগ্রাফের তারের মারফৎ আমরা যে শব্দ শুনতে পাই, তার সঙ্গে বাতাসের কোন সম্পর্ক নেই, তার কারণ টেলিগ্রাফের ব্যাপারে শব্দ-তরঙ্গকে (Sound waves) বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বদ্‌লে ফেলে তারের মারফৎ পাঠানো হয়। অর্থাৎ তারের ভেতর দিয়ে শব্দ যায় না, যায় শব্দের নূতন রূপ ঐ ইলেকট্রিক-কারেণ্ট। যখন শোনবার দরকার হয় সেটা সেখানে আবার বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে বদলে নেওয়া হয়, এই ভাবেই কাজ চলে। তবে সমুদ্রের তলায় জল ও আরও নানারকম বাধা বিপত্তি থাকে বলেই সমুদ্রের তলা দিয়ে যে টেলি-গ্রাফের তার নেওয়া হয়, সেটা সাধারণ টেলিগ্রাফের তারের চেয়ে ঢের বেশী মজবুত এবং সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে তৈরী—সেটা তৈরী হয় এইভাবে, প্রথমে থাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যাবার তামার তার, তার ওপর থাকে নিকেল লোহা আর তামা সব মিশিয়ে-তৈরী ধাতুর পাঁচ পর্দা ফিতে জড়ানো, তার ওপর

থাকে গাটাপার্চ্চার পর্দ্দা, এই গাটাপার্চ্চার পর্দ্দার ওপর আবার এক পুরু মশলা মেশানো পাট জড়ানো হয়, তারপর তাকে আবার গ্যাল্‌ভানাইজড চাদর আর ইস্পাতের তার দিয়ে মোড়া হয়। সব শেষে রবার মেশানো পাট দিয়ে সেটা ঢাকা হয়। এই হলো জলের তলার টেলিগ্রাফের তার যাকে বলা হয় 'কেবল্' (Cable)। এই 'কেবল্' সমুদ্রের তলায় পাতবার জন্যে একরকমের আলাদা ধরণের জাহাজ আছে—তাকে বলা হয়, 'কেবল লেয়ার্স' (Cable layers)। সমুদ্রের তলায় এই 'কেবল্-তার' দেড় হাজার ফুট গভীরতা থেকে ১২।১৩ ফুট গভীরতার মধ্যে পাতা থাকে।

পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে কোন্ কোন্ দেশে কি কি করা হয়েছে ?

ফ্রান্সে ২৭৬৫ ফুট খুঁড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর কুয়া 'আর্তেজীয় কূপ' তৈরী হয়েছে। বেলজিয়ামে ৪০০০ ফুট খুঁড়ে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর কয়লার খাদ। পৃথিবীর বুকে ৮০০০ ফুট খুঁড়ে 'মোরা বেলহো' বলে পৃথিবীর গভীরতম সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে ব্রেজিল দেশের লোকেরা। ক্যালিফোর্ণিয়াতে ১০০০০ ফুট পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক খুঁড়ে পাওয়া গেছে খনিজ তেলের সন্ধান।

মাটির নীচে 'পাতাল-ঘর' ব'লে কিছু ছিল নাকি ?

প্রাচীন ভারতে মাটির নীচে রাজাদের প্রাসাদ তৈরী হতো—পুরাণে ও রামায়ণ মহাভারতে একথা পাওয়া যায়। ইতালী, রোম, মিশর ও আলেক-জান্দ্রিয়াতে প্রাচীন যুগের খৃষ্টানরা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে তার দু'পাশে কফিনের মধ্যে মৃতদেহ পুরে রেখে আসতো—একে বলা হয় ক্যাটাকোম্ব (Catacomb); এইগুলোকেই বলা চলে সেকালের পাতাল-ঘর।

পৃথিবীর সবসেরা

পৃথিবীর 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস কি ?

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য জিনিস বলতে প্রাচীন যুগে বোঝাতো এই ক'টি জিনিস—এক পিরামিড ছাড়া এর সব ক'টি জিনিসই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(১) **মিশরের বিখ্যাত পিরামিড**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় তিন হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। নীল নদের পশ্চিম পারে কায়রো শহরের বিপরীত দিকে 'গিজেহ্' বলে জায়গাটি থেকে ৬০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত এই পিরামিডের সারি দেখা যায়। এগুলির মধ্যে মিশরের রাজা জোসারের কবরের উপর 'সাগ গারা' পিরামিডটি সবচেয়ে প্রাচীন।

(২) **মসোলিয়ম**—এশিয়া মাইনর প্রদেশের ক্যারিয়া প্রদেশের বিখ্যাত রাজা মসোলাসের এই স্মৃতিমন্দির তৈরী করান তাঁর রাণী আর্তেমেশিয়া—খৃঃ পূঃ ৩৫২ অব্দে প্রাচীন গ্রীসের বিপরীত দিকে ঈজিয়ান সাগরের তীরে হালিকার্ণাসাস বলে জায়গাটিতে। প্রাচীনকালে এটি সুন্দর কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল—ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে।

(৩) **ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান**—বর্ত্তমান বাগদাদ শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে এটা তৈরী হয়েছিল ৩৩৫ ফুট উঁচু আর ৮৫ ফুট চওড়া এক দেওয়ালের ওপর—তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট নেবুকাডনেজার—কারণ তাঁর রাণী আমাই-তেস ছিলেন ঠাণ্ডা 'পাহাড়ে' দেশের মেয়ে—ব্যাবিলনের গরম হাওয়া তাঁর সহ্য হত না—তাই সম্রাট অতো উঁচু দেওয়াল গেঁথে তার ওপর বাগান আর থাকবার মত প্রাসাদ করিয়ে দেন। এটা তৈরী হয়েছিল এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে—ইতিহাসে সে কথা জানা যায়।

(৪) **রোডস্ দ্বীপের 'কলোসাস্'**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার—প্রায় ২৯২ বছর আগে রোডস্‌বাসীরা গ্রীক দেবতা এপোলোর মূর্ত্তির অনুকরণে তাদের হেলিওস দেবতার প্রায় ১২০ ফুট লম্বা পেতলের মূর্ত্তি গড়ে তোলে—গড়তে ৩০০

কারিকরের বারো বছর সময় লেগেছিল। লিণ্ডাসের রাজা চার্লস এটি রোডস্ দ্বীপের বন্দরে প্রতিষ্ঠা করেন—এটি যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ২২৪ বছর আগেই ধ্বংস পেয়েছে।

(৫) **এফিসাসের 'ডায়না দেবীর মন্দির'**—প্রাচীনকালে এশিয়া মাইনর প্রদেশে 'এফিসাস' বলে এক শহর ছিল, বর্ত্তমানে স্মার্ণা শহরের দক্ষিণে ইজিয়ান সাগরের পূর্ব্ব দিকে। প্রাচীন গ্রীক্ স্থপতিবিদ্ সিসিফনের (Ctesiphon) পরিকল্পনা অনুযায়ী খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই মর্ম্মর মন্দির গড়ে উঠেছিল। এই মন্দিরে ১২৭টা মার্ব্বেলের থামের ওপর ছাদ তোলা হয়েছিল—এই থামগুলো ছিল ৬০ ফুট উঁচু—আর ওজন ছিল এক একটার দেড়শো টন। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে হেরোষ্ট্রেটাস্ বলে এক পাগল এটিকে পুড়িয়ে দেয়।

(৬) **অলিম্পিয়ার 'জুপিটার' মূর্ত্তি**—গ্রীসের দক্ষিণ উপকূলের পশ্চিম দিকে অলিম্পিয়ার উপত্যকায় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার সাড়ে চারশো বছর আগে এই মূর্ত্তিটি নাকি তৈরী হয়। ফিডিয়াস্ বলে প্রাচীন যুগের এক গ্রীক ভাস্কর এথেন্স থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে এই মূর্ত্তি গড়া সুরু করেন—শ্বেত পাথরের উপর হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করে—মূর্ত্তিটিকে সোনার পাতের পোশাকে মোড়ানো হয়। মূর্ত্তিটি ৪০ ফুট উঁচু ছিল বলে শোনা যায়।

(৭) **আলেকজান্দ্রিয়ার অন্তর্গত ফ্যারোস দ্বীপের আলোক-স্তম্ভ**—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ৩০০ বছর আগে মিশরের রাজা টলেমী ফিলা-ডেলফাস্ সোটার, ফ্যারোস দ্বীপে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে জাহাজকে পথ দেখিয়ে আনার জন্য এই আলোকস্তম্ভ তৈরী করান। এটি ৪০০ ফুট উঁচু ছিল বলে শোনা যায়। ১৩৭৫ খৃঃ অব্দের এক ভূমিকম্পে এটি ধ্বংস হয়ে যায়।

মধ্যযুগের 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস বলতে বোঝায়—
(১) নান্‌কিনের পোরসিলেনের তৈরী টাওয়ার স্তম্ভটি, (২) চীনের প্রাচীর, (৩) রোমের কলোসিয়ম, (৪) পিসার হেলান স্তম্ভ, (৫) কনস্তান্তিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মস্‌জিদ (এটি পূর্ব্বে গির্জ্জা ছিল—কিন্তু ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের

সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ এটিকে মস্‌জিদে পরিণত করেন, (৬) ইংলণ্ডের ষ্টোনহেঞ্জ, (৭) আলেকজান্দ্রিয়ার 'ক্যাঁটাকম্ব' প্রাসাদ। এই ক'টি জিনিসের মধ্যে নান্‌কিনের স্তম্ভটি—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহে ধূলিসাৎ হয়েছে। শুধু এর চিহ্ন হিসাবে এই স্তম্ভের চূড়ায় যে ধাতুপাত্রটি ছিল—সেটি রাখা আছে নান্‌কিনের দক্ষিণদিকের ফটকে। পিসার হেলান স্তম্ভ ও সোফিয়ার মস্‌জিদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসগুলিও ধ্বংশের পথে এগিয়ে চলেছে। এই সাতটির মধ্যে কেউ কেউ ইংলণ্ডের 'ষ্টোনহেঞ্জের' পরিবর্ত্তে আগ্রার 'তাজমহল'কে মধ্যযুগের সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি বলে ধরেন।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর 'সাতটি আশ্চর্য্য' জিনিস হলো—

(১) এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (নিউইয়র্ক)
(২) পানামা খাল
(৩) গোল্ডেন গেট ব্রীজ বা সেতু (সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো)
(৪) টেমস নদীর নীচে লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথ
(৫) আস্থন বাঁধ (মিশর)
(৬) ওয়াশিংটনের স্মৃতি মন্দির (যুক্তরাষ্ট্র)
(৭) সিন্ধুপ্রদেশের লয়েড্ বাঁধ

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলতে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বোঝায় ?

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিভাশালী মনীষী জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে লিওনার্দ্দো দ্য ভিঞ্চিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ লোকে তাঁকে শিল্পী বলেই জানে—কারণ তাঁর 'লাষ্ট সাপার' (Last Supper) ও 'মোনা লিসা' (Mona Lisa) ছবি শিল্পের জগতে এক বিস্ময়কর অবদান—কিন্তু তিনি শুধু ভাল ছবিই আঁকতে পারতেন না, তিনি ছিলেন উঁচুদরের ভাস্কর, স্থপতিবিদ্, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা করে গেছেন এবং পরে সে সমস্তই লোকে জানতে পেরেছে। বেতার, বিমানযান

আবিষ্কার হবার বহু আগে এ সমস্ত জিনিস নিয়েও যে তিনি মাথা ঘামিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা নিয়ে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—লোকে তাঁকে সাধারণতঃ 'কবি' বলেই জানতেন—কিন্তু তিনি ছবি আঁকা, বিজ্ঞান শিল্পের বিষয়েও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়ে গেছেন। অভিনেতা ও দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে—এমন লোকও পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ঘড়ি যেটি এখনও সময় দিচ্ছে সেটির ইতিহাস কি ?

ফ্রান্সের 'দিজন' অঞ্চলে নোৎরদাম গীর্জ্জার ওপরে যে ঘড়িটি দেখতে পাওয়া যায়—সেটিই নাকি পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি যেটি এখনও চলেছে।—এই ঘড়িটি তৈরী করেন জ্যাকেস মার্ক এবং শহরবাসীর সেবায় এটিকে উৎসর্গ করেন রাজা ফিলিপ দি হার্ডি—১৩৮৩ খৃঃ অব্দে। এই সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে ঘড়িটি বাজছে বলে 'দিজনে'-র অধিবাসীরা এটিকে পৃথিবীর গৌরবের সম্পদ বলে মনে করে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে আর একটি প্রাচীন ঘড়ি আছে, সেটি তৈরী হয় ১৪১০ খৃষ্টাব্দে, সেটিও এখনও ঠিক চলছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী পোশাক কার আছে ?

সবচেয়ে দামী পোশাক আছে হাওয়াই দ্বীপের রাজা তৃতীয় কামেহামেডার (Kamehameda III)। এই পোষাকটি একটি লম্বা ঝোলা জামা (cloak); এটি হাওয়াই দ্বীপের মধুখেকো ছোট ছোট মামো পাখীর হলদে আর লাল পালক দিয়ে আগাগোড়া তৈরী। জানা যায় যে, রাজার এই পোশাকের পালক জোগাড় করতে এত 'মামো' পাখী মারা হয়েছে যে, দেশ থেকে 'মামো' পাখী একেবারে লোপ পেয়েছে। বর্ত্তমানে হাওয়াই দ্বীপের রাজার এই পোশাকটির দাম কুড়ি হাজার পাউণ্ড বলে ধরা হয়েছে। এত দামী পোশাক পৃথিবীতে আর কারুরই নেই।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর দামী ঘোড়া কার ছিল ?

আমেরিকার আইওয়া প্রদেশের বুন অঞ্চলের মিঃ সি. জি. গুডের 'ব্রুকলিন সুপ্রিম' বলে যে ঘোড়া ছিল—৯ মাস বয়সে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তার ওজন হয়েছিল দেড় টনের কাছাকাছি—অর্থাৎ প্রায় ৪০ মণ আর কি ! অত মোটা আর অত বড় ঘোড়া এর আগে কেউ দেখেনি। এই ঘোড়াটার দাম উঠেছিল ১৬০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সময় দেয় কোন্ ঘড়িটি ?

কলকজাওয়ালা পুরানো ধরনের ঘড়িতে প্রায়ই সময়ের গোলমাল হয় একথা তোমরা জানো, কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীনউইচের মানমন্দিরে (Greenwich Observatory) যে বৈদ্যুতিক ঘড়ি বসানো হয়েছে—তাতে গোটা বছরে এক সেকেণ্ডের অতি সামান্য ভগ্নাংশের অনুপাতে সময়ের তফাৎ হয়—গ্রীনউইচের পেণ্ডুলাম দেওয়া ঘড়িতে এর আগে এমন সঠিক সময় ধরা সম্ভব হত না।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কোনটি এখনও রয়েছে ?

সুইডেনের 'স্টোরা কোপ্পারবার্গস বার্গস্লাগস অকটেবোলাগ' (Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag) নামের কোম্পানীটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে—এই কোম্পানীটি এখন সুইডেনের একটি কাগজের কারখানা পরিচালনা করেন। এটি গড়া হয়েছিল ১২৮৮ খৃঃ অব্দে—এরকম প্রমাণ এই কোম্পানীর পুরানো কাগজপত্রে পাওয়া গেছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে কোন্ ভাষায় বেশী লোক কথা বলে ?

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মোটামুটি হিসেবে জানা যায় যে, চীনে ভাষায় কথা বলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক। ৪৩ কোটি লোক কথা বলে এই চীনে ভাষায়। তারপরেই হচ্ছে ইংরেজী ভাষা—এই ভাষায় কথা বলে ২৭ কোটি লোক। তারপরে রুশ ভাষায় কথা বলে ৮ কোটি লোক, জাপানী ভাষায় কথা বলে

৫ কোটি লোক, স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে ৬॥ কোটি লোক। উর্দ্দু ও হিন্দীর সংমিশ্রণে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ লোক। বাঙলা ভাষায় কথা বলে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ রেলপথ কোথায় আছে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ রেলপথ আছে আমেরিকায়। সেখানকার লাইনের মোট লম্বা মাপ হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ শত ৪২ মাইল।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রেন (কপিকল) কোথায় আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে নেভিইয়ার্ড বলে বন্দরটিতে জাহাজ থেকে মাল খালাস করা, মাল বোঝাই করার জন্য যে ক্রেন আছে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রেন। এটি ২৫০ ফুট উঁচু—এবং ৩৫০ টন ওজনের মাল একসঙ্গে তুলতে পারে। এটি তৈরী করতে ২ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেতু কোন্‌টি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেতু বা পুল হচ্ছে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর 'ওকল্যাণ্ড' সেতু—এটা মোট লম্বা হচ্ছে সাড়ে আট মাইল। পৃথিবীর মধ্যে বড় ঝুলানো সেতু হচ্ছে 'গোল্ডেন গেট' ব্রীজ, সেটিও আছে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্কো উপসাগরের উপরে।

সবচেয়ে বড় জেপেলিন কোন্‌টি ?

সবচেয়ে বড় জেপেলিনের নাম 'হিণ্ডেনবার্গ'—এটা লম্বা ছিল ৯৭২ ফুট, আর ঘণ্টায় ৮৩ মাইল বেগে উড়তে পারতো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাতের ফুল কি কি ?

পৃথিবীর সবচেয়ে মস্ত ফুল যে কি তা ঠিক করে বলা শক্ত, যাইহোক জেনে রাখো—সুমাত্রা দ্বীপে 'র‍্যাফ্‌লেসিয়া' বলে একরকম ফুল আছে, তা যখন ফোটে তখন আড়াআড়িভাবে মাপে সেটা হয় প্রায় তিন ফুটের মতো। এছাড়া সুমাত্রায় আরও একরকম ফুল আছে সেটা লম্বা ধরণের কচু ফুলের মত—

সেগুলো লম্বায় প্রায় ষোল-সতের ফুট পর্য্যন্ত হয়। তার নাম হচ্ছে 'এমোর-ফোফ্যাল্যাস লিটানাম' (Amorphophallas-litanum)।

পৃথিবীতে কতগুলি জাতির জাতীয়-পতাকা আছে ?

যতদূর জানা যায়, ৮১টি জাতের জাতীয় পতাকা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জাতীয় পতাকাই তিনটি রং দিয়ে তৈরী। সব জাতের কাছে তার জাতীয় পতাকার সম্মান সবচেয়ে বেশী। তোমরাও যে তোমাদের জাতীয় পতাকাকে তেমনি ভালবাসবে সে কথা কি বলে দিতে হবে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাক টিকিট কোন্‌টি ? সেটির দাম কত ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাক টিকিট যা সংগ্রহ করা আছে, তার মধ্যে ১৮৫৬ সালের বৃটিশ-গায়েনার এক সেণ্ট দামের একখানি টিকিটই সবচেয়ে দামী ; এর দাম বর্ত্তমানে সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠেছে।

পৃথিবীর মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বড় যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি আছে ?

ব্রেজিলের রাজধানী রিও-ডি-জ্যানেরিও শহরে ২৪০০ ফুট উঁচু 'কর্কোভেডো' বলে যে পাহাড় আছে—তার ওপরে ১১০ ফুট লম্বা এক যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি আছে—এই মূর্ত্তিটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের যীশুমূর্ত্তি। এটি সিমেণ্ট আর ছোট ছোট পাথর জমিয়ে গড়া হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কি ?

হীরক হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। তবে কোন কোন বিশেষ ধরণের ইস্পাতও বর্ত্তমানে হীরকের মত কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আবক্ষ-মূর্ত্তি' বা বাষ্ট কোথায় আছে ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক শহরে মিঃ জর্জ্জ গ্রে বারনার্ড বলে এক মূর্ত্তিশিল্পী প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের যে আবক্ষ-মূর্ত্তি খোদাই করেছেন—সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আবক্ষ-মূর্ত্তি (Bust)। এই মূর্ত্তিটি ১৬ ফুট উঁচু।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শহর কোন্‌টি ?

সমুদ্রতট থেকে সবচেয়ে উঁচু শহর হচ্ছে বলিভিয়ার রাজধানী 'লা পাজ' (La Paz); এটি সমুদ্রতট থেকে ১২,৭০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলওয়ে স্টেশন আছে পেরু প্রদেশের 'মরোকোথা' (Morococha) বলে জায়গাটিতে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত কে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত বলতে বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মেক্সিকোর—'সাণ্ট্যা ম্যারিয়া দেল ট্যুল্' গ্রামের প্রকাণ্ড সাইপ্রেস গাছটিকে। এই গাছটির বয়স মেপে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন—এটির বয়স ৫ হাজার বছরেরও বেশী—এই গাছটির গুঁড়ির বেড় ১৭৫ ফুট। এই গাছটি 'El Tule' নামে পরিচিত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুক্তা কোনটি ?

পৃথিবীতে যত মুক্তা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের মুক্তাটি পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পালাওয়ান দ্বীপের ব্রুক্স পয়েণ্ট বলে জায়গাটিতে। এটি মাপে ৯ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় ৩ থেকে ৫॥ ইঞ্চি —এই মুক্তাটি শামুকের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়নি—এটি পাওয়া গেছে ক্ল্যাম্ নামক বড়গোছের একটি সামুদ্রিক জীবের খোলার ভেতর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফোয়ারা কোথায় আছে ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের গ্রাণ্ট পার্কে—'বাকিংহাম মেমোরিয়াল ফাউণ্টেন' বলে যে ফোয়ারাটি আছে সেইটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফোয়ারা। এটি মিস্ কেট্ বাকিংহাম বলে এক মহিলা তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে শিকাগো শহরে তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। এই ফোয়ারার চারিধারে সবসুদ্ধ বাহাত্তরটি উৎস-মুখ আছে, সেখান থেকে জলের ধারা বেরিয়ে ৩০০ ফুট চওড়া এক জলধারা তৈরী করে, আর মাঝখানের উৎস-মুখ

থেকে ৮০ ফুট উঁচুতে জল ওঠে। এই ফোয়ারা খুলে দিলে মিনিটে ১৬০০ গ্যালন জল বেরোয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ কোথায় আছে ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন শহরে 'ওয়াশিংটন ন্যাশন্যাল মনুমেন্ট' নামে যে স্তম্ভটি আছে—সেটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট, ওয়াশিংটনের স্মৃতিতে স্থাপিত হয়েছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এটির নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হয়—কিন্তু শেষ হওয়ার আগে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু হয় ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর কাজ শেষ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর-এর মধ্যে সাধারণের প্রবেশাধিকার ঘোষণা করা হয়। এটি লম্বায় ৫৫৫ ফুট—এর ভেতরের ৯০০ সিঁড়ি বেয়ে তবে ওপরে ওঠা যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কোন্ দেশে পাওয়া গেছে ?

আমাদের ভারতবর্ষেই পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। অজন্তার ও বাঘগুহার দেওয়ালের আঁকা ছবি, ইলোরার গুহায় পাথরের খোদাই করা যে সব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই নাকি পৃথিবীর প্রচীনতম শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। ভারতের সবচেয়ে বড় খোদাই করা মূর্ত্তি হচ্ছে, মাদ্রাজের মহাবলী-পুরমের মন্দিরে 'অর্জ্জুনের তপস্যা' বলে যে মূর্ত্তি আছে সেটি। এটি লম্বা ৯৬ ফুট, চওড়া ৪৩ ফুট, আর উঁচু ৩০ ফুট।

পৃথিবীর সবচেয়ে মুল্যবান হাতে আঁকা ছবি কোনটি ?

শিল্পী 'গেন্‌স্‌বরো'র (Gainsborough) আঁকা 'ব্লু বয়' (Blue Boy) বলে ছবিটির দামই এখন সবচেয়ে বেশী—১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয় এবং সেই ছবিটি পরে শিল্পী রেণল্ডসের আঁকা 'মিসেস্ সিডন্‌স্ এ্যাজ দি ট্রাজিক মিউজ' নামের ছবিটির সঙ্গে একত্রে ২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের হাতে আঁকা ছবি (Oil painting) কোথায় আছে ?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাপের ছবি অয়েল পেণ্টিং টাঙ্গানো আছে ভিনিসের ডোগেস্ প্যালেসের (Doge's Palace) হলঘরে—এই ছবিটির নাম 'প্যারাডাইস্' (Paradise)। ছবিটি ৮২ ফুট লম্বা ও ৩৩ ফুট চওড়া।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জোরে ট্রেন চলে কোথায় ?

আমেরিকার ডজ্ সিটি (Dodge City) থেকে লা জুণ্টের (La Junte) মধ্যে 'সুপার চীফ' (Super Chief) বলে ডিসেল ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত যে ট্রেনটি যাতায়াত করে সেইটি পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন। ঘণ্টায় ৮৭ মাইল বেগে এই ট্রেন চলে। কিংস ক্রশ থেকে ইয়র্ক পর্য্যন্ত 'করোনেশন এক্সপ্রেস' ঘণ্টায় ৭২ মাইল বেগে ছুটে চলে। এটি বৃটিশ রাজ্যের দ্রুতগামী ট্রেন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা 'রেলপুল' কোথায় আছে ?

পূর্ব্ব-আফ্রিকার নিম্ন জাম্বেসী প্রদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা রেলপুল আছে—এটা লম্বায় ১২০৬৪ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু রেলপুল হচ্ছে ফ্রান্সের 'ফ্যাডেস্ ভিয়াডাক্ট' সেতুটি—এটি ৪৩৪ ফুট উঁচু।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ কি ?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ হচ্ছে 'কুইন এলিজাবেথ্' নামে জাহাজটি। এটি ৮১ হাজার টনের জাহাজ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদ কোথায় আছে ?

স্পেনের 'মাদ্রিদ' শহরে যে রাজপ্রসাদ আছে সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হোটেল কোনটি? কোথায় আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রের শিকোগো শহরের 'ষ্টিভেন্স হোটেল' পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে

বড় হোটেল। এই হোটেলে অতিথিদের থাকবার জন্য সাতাশ শো ঘর আছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় 'ছবিঘর' বা 'সিনেমা' কোথায় আছে?

যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক শহরে 'রক্সি' থিয়েটার বলে যে ছবিঘর বা সিনেমা হাউস আছে, সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই থিয়েটারের হলে ৭০০০ লোক একসঙ্গে বসতে পারে।

পৃথিবীর মধ্যে কোন ষ্টেশনটির নামে সবচেয়ে বেশী অক্ষর আছে?

বৃটেনের এঞ্জেলসী অঞ্চলের এল-এম-এস রেলের ছোট স্টেশনটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নামের স্টেশন। নামটা দিলুম।

LLANFAIRPWLLGWYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLL-ANTSILIOGOGOGOCH

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘণ্টা কোনটি?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘণ্টা হচ্ছে, মস্কোর 'জার' (Tsar Bell) ঘণ্টাটি। এটি তৈরী হয় ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে, এটির ওজন হচ্ছে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ১৯৬ টনের বেশী। এটা লম্বায় সাড়ে উনিশ ফুট আর ব্যাস হচ্ছে ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি।

পৃথিবীতে মোট কতরকমের ভাষা আছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে একেবারে সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি হিসাবে যতটা জানতে পারা যায়—সে হিসাবে পৃথিবীতে কমসে কম ৩৪২৪ রকমের ভাষা আছে। এবং জানা যায় তার মধ্যে এক ভারতবর্ষেই কমপক্ষে ২২২টি ভাষা আছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী রকমের ভাষা জানতেন কে?

রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদের গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান যিনি ছিলেন, সেই কার্ডিন্যাল মেজ্জোফ্যান্টি (Cardinal Mezzofanti) ১২৪টি ভাষা জানতেন। পরের যুগে ১৮৩৭ সালের রাজ্যাভিষেকের সময় প্রোফেসর আর, জি, কেণ্ট

বলে যে আমেরিকান অধ্যাপক লণ্ডনে আসেন তিনি ৪০টি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারতেন। ভারতবাসীদের মধ্যে হরিনাথ দে ৩৪টি ভাষা জানতেন। তাঁর চেয়ে বেশী রকমের ভাষায় আর কোনও ভারতবাসীই ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারেন নি।

পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে বড় ঘড়ি আছে?

'মনট্রিল' শহরের ঘড়ি-ঘরে যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা আছে সেইটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘড়ি। 'মনট্রিলের' ঘড়িঘর ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ঘড়িঘরের চেয়ে বারো ফুট বেশী লম্বা এবং মাটি থেকে ৩৩০ ফুট উঁচু। এই ঘড়িটার তিনটে ডায়াল (Dial) আছে—প্রত্যেকটার ব্যাস হচ্ছে ৬০ ফুট—এই ঘড়ির ঘণ্টা নির্দ্দেশের কাঁটাটা ২০ ফুট লম্বা, ওজনেও প্রায় ১৯ মণ—মিনিট নির্দ্দেশের কাঁটাটি ৩০ ফুট লম্বা ও ওজনে প্রায় ৩৭ মণের কাছাকাছি। বিদ্যুতে চলা সবচেয়ে বড় ঘড়ি আছে দক্ষিণ আফ্রিকার র‍্যাণ্ডের বিমান বন্দরে। এই ঘড়িটা বিমান বন্দরের জমিতে আকাশের দিকে মুখ করে চিৎ করা অবস্থায় আছে যাতে আকাশ থেকে ঘড়িটা দেখা যায়।

পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশী জমিতে চাষ হয়?

যুক্তরাষ্ট্রে চাষ আবাদের কাজে যতটা জমিকে লাগানো হয়েছে অমন আর কোথাও হয়নি—সেখানে ৩ কোটি ৪২ লক্ষ একর মাপের জমিতে চাষ করা হয়—রাশিয়াতে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ একর মাপের জমিতে চাষ আবাদ হয়। তারপরেই আমাদের ভারতবর্ষ ; আমাদের দেশে ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদ হয়, অথচ আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব জাতির মতই বেঁচে থাকি এটাই আশ্চর্য্যের কথা।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গভীর খনি কোথায় আছে?

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে ৭৫০০ ফুট গভীর খনি আছে—সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খনি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'মোটরবাস' কোথায় চলাচল করে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মোটরবাস সম্প্রতি তৈরী হয়েছে বর্ত্তমান যুদ্ধে সৈন্য আনা-নেওয়ার জন্য। এই মোটরবাস আমেরিকার কলোরেডো স্প্রিংয়ের কাছাকাছি ক্যাম্প কারসন বলে জায়গায় সৈন্য ছাউনিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই মোটরবাসের একটিতে ২৬০ জন একসঙ্গে বসে যেতে পারে।

সিরিয়ার দামাস্কাস শহর থেকে ইরাকের 'বাগদাদ' শহরে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মোটরে যাওয়া। পাঁচশো মাইলের এই পথ অতিক্রম করার জন্যে এক নূতন ধরণের মোটরযান সেখানে বর্ত্তমানে চলাচল করে ; এইগুলি পৃথিবীর অন্যতম বড় মোটরযান। এই গাড়ীগুলিতে ১৮টি চাকা আছে—গাড়িটি ৬৮ ফুট লম্বা এবং ৮ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া। এই মোটরযানে ৩৬ জন আরোহী আরামে ব'সে এবং শুয়ে যাতায়াত করতে পারে। এই মোটরযানের পেট্রল ট্যাঙ্কে একসঙ্গে আড়াইশো গ্যালন তেল ধরে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গাছ কোনটি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গাছ হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়ার 'ম্যামথগ্রোভ' পার্কের "জেনারেল শ্যারম্যান" নামে সিকোইয়া গাছটা। এটা লম্বায় ৩০০ ফুট উঁচু। আর বৃটিশ রাজ্যের সব চেয়ে লম্বা গাছ আছে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে। এটি একটি ইউক্যালিপ্টাস গাছ, লম্বা ২৯০ ফুট, গাছটার বেড় হচ্ছে ৬৩ ফুট অর্থাৎ পনরো জন লোক হাত ধরাধরি করেও গাছটাকে বেড় দিতে কষ্ট হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক কে ? সবচেয়ে লম্বা জাতি কারা ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোক যে কয়জন ছিলেন, তার মধ্যে একজন জাতিতে রাশিয়ান, নাম—মাকনফ (Macknov), অপরজন ল্যাঙ্কা-শায়ারের হেল ব'লে জায়গার জন্ মিডল্টন্, এঁরা দু'জনেই লম্বায় ছিলেন

৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। বর্ত্তমানে যিনি সবচেয়ে লম্বা লোক, তাঁর নাম জেক্ এরলিক্ (Jake Erlich)। ইনি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। প্যাটাগোনিয়ার (Patagonia) লোকেরা অন্য সব জাতের মানুষদের চেয়ে লম্বা হয়। এদেশের পুরুষরা গড়ে ৭৩ ইঞ্চি বা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে একটানা সোজা ও লম্বা রেললাইন কোথায় আছে ?

পৃথিবীর একটানা সোজা আর লম্বা রেল লাইন আছে—অষ্ট্রেলিয়ার নাল্লাবার প্লেনের ওপর। এখানকার ট্রান্স্ কন্টিনেণ্টাল রেলওয়ের লাইন একটানা সোজা ৩২৮ মাইল গেছে। এই তিনশো আটাশ মাইলের মধ্যে কোথাও একটি নদী পার হতে হয় না এবং একটিও গাছ নজরে পড়ে না।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী কোথায় ?

উঁচু বাড়ী নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ; বাড়ীটাতে আছে ১০২ তলা, আর উঁচু হচ্ছে ১,২৪৮ ফুট। এটি ১০৪ তলা বাড়ী—মাটির নীচে ২ তলা আছে। এই বাড়ীটির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে হেঁটে সবচেয়ে উপর তলায় যেতে প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগে। তবে এর চেয়ে একটি উঁচু বাড়ী তৈরী শুরু হয়েছিল রুশিয়ায়—সেটির নাম প্যালেস অফ্ দ সোভিয়েট—এই বাড়ীটি যখন তৈরী হবে তখন সেটি উঁচু হবে ১৩৬৪ ফুট। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীর লোহার কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল—কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সেই সমস্ত লোহার কড়ি বরগা খুলে নিয়ে কামান আর গোলা তৈরীর জন্যে গালিয়ে ফেলা হয়। জার্ম্মানরা হেরে যাওয়ার পর —আবার রাশিয়ানরা এই বাড়ী তৈরীর কাজে লেগেছে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে।

পৃথিবীর সেরা ধনী বলতে কাদের নাম করা চলে ?

এড্ সেল ফোর্ড (মার্কিন), হেনরী ফোর্ড (মার্কিন) ; রথচাইল্ড (ইহুদী) ; ডিউক অফ্ ওয়েষ্টমিন্ষ্টার (ইংরেজ), বরোদার গায়কবাড় (ভারতীয়) ; আগা খাঁ (ভারতীয়) ; হায়দ্রাবাদের নিজাম (ভারতীয়) ;

সাইমন পাতিনো (বলিভিয়া), লর্ড আইভিয়াগ (ইংরেজ); রকফেলর (মার্কিন); লুই ড্রেফাস্ (ফরাসী); ফ্রিৎজ থাইসেন (জার্ম্মান); ফ্রেডরিক ফ্লিক (জার্ম্মান); এন ইয়াং সাং (চীনা)।

পৃথিবীর মধ্যে কোন শিকারী সবচেয়ে বেশী প্রাণী বধ করেছেন ?

লর্ড রিপন সবচেয়ে বেশী প্রাণী শিকার করেছেন বলে জানা যায়। ডিউক অফ্ পোর্টল্যাণ্ড তাঁর মোট শিকারের হিসাব দিয়েছেন। তাঁর হিসাব থেকে জানা যায় লর্ড রিপন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট ৩৭০,৭২৮টি প্রাণীকে বধ করেছেন। এই হিসাবের মধ্যে বাঘ, গণ্ডার, বন্যমহিষ, সম্বর, হাঁস, পাখী, খরগোস, হরিণ সবই ধরা হয়েছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ কোনটি ?

বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ হচ্ছে আমেরিকার "Midway" বলে এয়ার-ক্রাফট্ ক্যারিয়ার শ্রেণীর জাহাজটি—এটিতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগানো হয়—তা ১০ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাতিকে এক সঙ্গে জ্বালাতে পারে। এতে যে পরিমাণ লোহালক্কড় ও মালমশলা লেগেছে—তা দিয়ে ২৫ হাজার মোটর গাড়ী তৈরী হতে পারতো।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর কোনটি ?

লণ্ডন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর। এখানে প্রায় ছিয়াশী লক্ষ লোক বাস করে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা 'মোটর-রাস্তা' কোথায় আছে ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা মোটর চলার রাস্তা হচ্ছে প্যাসিফিক হাইওয়ে—যে রাস্তাটি ক্যানাডার পশ্চিম উপকূলের ভ্যানকুভার শহর থেকে মেক্সিকান সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়েছে সেটি দেড় হাজার মাইল লম্বা। অপরটি আটলান্টিক সিটি থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া, সেণ্ট লুইস্ ডেনভার, সল্ট-লেক, সিটি, সাক্রামেণ্টো ও ওক্ল্যাণ্ড হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গেছে

—এটি ৩২১৯ মাইল লম্বা। এর চেয়ে লম্বা মোটর চলার রাস্তা তৈরী হচ্ছে—সেটি আলাস্কা থেকে 'টিয়েরা ডেল্ ফুয়েগো' অবধি যাবে। এটি তৈরী হবার পর এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাস্তা বলে গণ্য হবে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বই কোনটি?

সবচেয়ে বড় আকারের বই হচ্ছে ভিয়েনার ষ্টেট টেক্‌নিক্যাল স্কুলের 'Anatomical Atlas' বলে বইটি। এটির মাপ লম্বায় প্রায় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ফুট। এটি ছাপতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বছর লেগেছিল। পাতার সংখ্যা হিসাবে সবচেয়ে বড় বই হচ্ছে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট যে চীনা অভিধান লেখান সেইটি। এই বইটি ৫০২০টি ভলিউম্ বা খণ্ডে ভাগ করা, এক এক খণ্ডে ১৭০টি করে পৃষ্ঠা আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী বই কোনটি?

সবচেয়ে বেশী দামে বিক্রী হয়েছে এই হিসাবে সবচেয়ে দামী বই হচ্ছে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার মাউণ্ট সিনাইয়ের পাদদেশে সেণ্ট ক্যাথারিণ-এর মন্দিরে কোডেক্স সিনাইটিকাস্ ব'লে নিউ টেস্টামেণ্টের সবচেয়ে প্রাচীন যে সংস্করণ পাওয়া গেছে সেইটি। এটি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রুশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করেছেন। সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছে এই হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী বই হচ্ছে, পারস্যের শাহের কাছে আফগানিস্তানের আমীর হাতেলেখা যে পুঁথিটা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন সেইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বইটি বাঁধাতেই নাকি খরচ পড়েছে ৩০০০০ পাউণ্ড। কারণ এই পবিত্র বইটির মলাট সোনার পাত দিয়ে মোড়া ও নানা রত্নে খচিত। হীরা, চুনী, মুক্তা বসিয়ে এই বইয়ের বাঁধাই করা হয়েছে—এটি বাঁধাতে মোট ৩৯৮টি মণিমুক্তা লেগেছে।

পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশের লোক বেশীদিন বাঁচে?

রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ইলিন মানুষের বয়স নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি দেখেছেন রুশিয়ার লোকরাই বরাবর অন্য দেশের বাসিন্দাদের চেয়ে

বেশী দিন বাঁচে। রুশিয়ার লোক গণনার হিসাবে দেখা গেছে এখনও সেখানে এমন লোক ৩০ হাজারেরও বেশী আছে—যাদের বয়স একশো বছরেরও বেশী। এখনও রুশিয়াতেই কেবল একটি ১৬৬ বছরের লোক বেঁচে আছেন। ইনিই বর্ত্তমানের সবচেয়ে বেশী বয়সের জীবিত মানব।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান কোথায় আছে ?

লণ্ডনের চ্যারিং ক্রশ রোডের ওপর ডবলিউ. এণ্ড জি. ফয়েল লিমিটেড (W. &. G. Foyle Ltd.) বলে যে বইয়ের দোকানটি আছে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুস্তক বিক্রেতা। এই বইয়ের দোকানের শাখা ডাবলিন, টরেন্টো ও কেপটাউনে আছে। দোকানটিতে ৩০ লক্ষ বই মজুদ রাখা হয়। দোকানটিতে ৫০০ লোক কাজ করে এবং প্রত্যেক দিন গোটা পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০ হাজার চিঠি আসে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী পদার্থ কি ?

'রেডিয়াম্'কে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী পদার্থ বলা হয়—এক গ্র্যাম্ (Gramme) রেডিয়ামের দাম ১৪৪৪০ পাউণ্ড—অর্থাৎ—দেড়লক্ষ টাকার উপর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সোনার খনি কোথায় আছে ?

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিগুলি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সোনা উৎপাদন করে। এখানে বছরে গড়ে ১১৭৩৫০০০ আউন্স সোনা তোলা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সোনার ঢেলা কোন্ খনিতে পাওয়া গেছে, এবং কোথায় আছে ?

অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের সোনার খনিতে সবচেয়ে বড় সোনার ঢেলা পাওয়া গেছে। এটির নাম 'Welcome Stranger' বর্ত্তমানে এটি ইংলণ্ডে আছে—এটির ওজন ২৫২০ আউন্স।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'হীরকখণ্ড' কি ?

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রিমিয়ার খনি থেকে 'কুল্লিনান' (Cullinan) বলে যে হীরকখণ্ড পাওয়া যায় সেটিই পৃথিবীর

সবচেয়ে বড় হীরকখণ্ড বলে বিখ্যাত। এটির আসল ওজন ছিল ৩১০৬ ক্যারাট এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভ্যাল গভর্ণমেণ্ট বৃটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডকে এটি উপহার দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এটি কেটে ৯টি হীরকখণ্ডে পরিণত করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খণ্ডটিই 'ষ্টার অফ্ আফ্রিকা' নামে বিখ্যাত হীরকখণ্ড বলে পরিচিত।

গত মহাযুদ্ধে মৃত সৈনিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে পৃথিবীর মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বড় 'মেমোরিয়াল' তৈরী হয়েছে?

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের 'থিয়াপ্ভাল্' (Thiepval) বলে জায়গাটিতে যে 'মনুমেণ্ট'টি তৈরী হয়েছে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ। এই মনুমেণ্টের গায়ে ৭৩৪১৩ জন মৃত সৈনিকের নাম লেখা আছে যাদের অন্তিম শয্যার কোন সন্ধান জানা যায়নি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'ষ্টীম-লাইনড' (Stream-lined) জাহাজ কোথায় আছে?

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ষ্টেটে 'পিউজেট সাউণ্ড নেভিগেশন কোম্পানী'র 'কাহ্-লক্-আহ্-লাহ্' (Kah-Lock-Ah-Lah) বলে যে ষ্ট্রিমলাইন্ড্ জাহাজটি 'সিট্ল্' (Seattle) থেকে 'ব্রিমারটন' (Bremerton) যাওয়া আসা করে সেটিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ষ্ট্রীমলাইন্ড্ জাহাজ। জাহাজটিতে ২০০০ আরোহী ও ১১০ খানি মোটরগাড়ী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কার্পেট কোথায় আছে?

নিউইয়র্কের ওয়ালডর্ফ এ্যাষ্টোরিয়া (Waldorf Astoria) হোটেলে সবচেয়ে বড় কার্পেট আছে, এটি লম্বায় ৭০ ফুট ও চওড়ায় ৫০ ফুট। এই কার্পেটটির কোথাও জোড়া নেই।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের পতাকা কোন্ দেশে আছে?

আমেরিকায় আমেরিকান জাতির একটি জাতীয় পতাকা আছে—যেটির মাপ হচ্ছে ২০,৭০০ বর্গ ফুট—সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়মাপের পতাকা।

পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন

রবিবার ছুটি কেন ?

ওটা খৃষ্টানদের মতে Lord's Day অর্থাৎ ঐদিন যীশুখৃষ্টের কাজে সবাইকে লাগতে হয়। ৩২১ খৃঃ অব্দে রোমসম্রাট কন্‌ষ্টেন্‌টাইন আইন ক'রে ঐ দিনে একমাত্র কৃষি কাজ ছাড়া সব কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকেই রবিবার দিন ছুটির প্রচলন হয়েছে। খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথম এদেশে রবিবার দিনকে ছুটির দিন ব'লে ঘোষণা করেন।

এক ঘণ্টা সময়কে ৬০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে কেন ?

এ ব্যবস্থাটা হয়েছে এইজন্যে যে, যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়া এবং আসিরিয়ায় যে সুমিরিয় জাতি বাস করত, তারাই প্রথম সময়ের মাপ আবিষ্কার করে এবং তখনকার দিনে এক থেকে ষাট পর্য্যন্তই ছিল সংখ্যা গণনার মাপকাঠি। অর্থাৎ এখন যেমন আমরা এক থেকে একশো পর্য্যন্ত গুণে আবার একশো-এক, একশো-দুই এমনি ক'রে গণনা করি তারা সে হিসেব জানত না। কাজেই তারা সময়ের মাপ করবার বেলায়ও ঐভাবে যাট ভাগে ভাগ ক'রেই এক ঘণ্টা তৈরী করেছিল। সেই থেকেই ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা ও ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, এই ভাবেই সময়ের হিসেব চলে আসছে।

ঘড়ি যখন চলে তখন টিক্ টিক্ ক'রে শব্দ হয় কেন ?

তার কারণ বুঝতে হ'লে বাবা, মা, বা দাদা, দিদিকে বলবে একটা ঘড়ির পেছন দিককার ঢাকনা খুলে তোমাদের দেখাতে। দেখবে ঘড়ির ভেতরে অনেকগুলো চাকা আছে। সেকেণ্ডের কাঁটার পেছনে যে চাকাটা ঘুরছে, তার পাশে একটা চাকা একবার এদিক্ ওদিক্ এই রকম ক'রে ঘুরছে, তাকে বলা হয় ব্যালান্স হুইল। বড় ঘড়িতে পেণ্ডুলাম যে কাজটি করে, ছোট ঘড়িতে এটি সেই 'ঘড়ির চলার গতি'তে সমান তাল বজায় রাখার কাজটি করে।

আচ্ছা এর সঙ্গেই দেখবে লাগানো রয়েছে দু'দাঁতওয়ালা কাঁটা চামচের মত একটি ছোট অংশ—এই অংশটিকে বলা হয় 'প্যালেট ফর্ক ও আরবার' (Pallet Fork & Arbour) ; এর শেষ প্রান্তের দুটো দাঁত পাশের ঘুরন্ত চাকাটিকে বা Escape wheel-কে একবার আটকাচ্ছে, আর একবার ছেড়ে দিচ্ছে। এই আটকানো ,আর ছাড়ার ব্যাপারটা ঘটছে প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে এবং প্রতিবারই ঠোকাঠুকির ফলে একটা টিক্ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে ; এখন অনবরতই ঘড়ি চলছে, কাজেই সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড ঘড়ি টিক্ টিক শব্দ করেই চলেছে।

থার্মোমিটার ভেঙে গেলে, পারাটা চারিধারে গড়িয়ে পড়ে অথচ কাগজ দিয়ে বা হাতে ক'রে সহজে তোলা যায় না কেন ?

এর কারণ হচ্ছে এই যে, পারার ছোট ছোট গোল টুকরোগুলোকে নিরেট মনে হলেও আসলে পারা জিনিষটা জলের মতই তরল পদার্থ। কাজেই জল যেমন হাত দিয়ে টিপে ধরা যায় না, পারাও তেমনি ধরতে পারা যায় না। অন্যান্য তরল পদার্থের ধর্ম্মানুযায়ী সেও হাত ফস্‌কে পালায় বা জলের মতই গড়িয়ে পড়ে।

ঘি বা মাখন আগুনে জ্বাল দিলে গলে, অথচ ছানা ওরকম গলে না কেন ?

এর কারণ কি জান ? ঘি বা মাখনে চর্ব্বির (Fat) অংশই বেশী থাকে, ছানাতে প্রোটিনের (Protein) অংশটিই বেশী। অর্থাৎ ঘি বা মাখনে কার্ব্বন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের ভাগটাই এমন ভাগে থাকে যাতে সেটা সহজেই গলতে বা পুড়তে পারে—কিন্তু ছানাতে থাকে নাইট্রোজেনের ভাগটাই বেশী, কাজেই সেটা ওভাবে গলানো সম্ভব হয় না।

ব্লটিং কাগজ কালি শুষে নেয় কেন ?

তার কারণ ব্লটিং পেপার এমনভাবে তৈরী করা হয়, যাতে কাগজটিতে তুলার আঁশের মতই জলশোষক আঁশ থাকে, অর্থাৎ এই আঁশের কোষে

কোষে বায়ুভর্ত্তি খুব ছোট ছোট ছেঁদার ব্যবস্থাও থাকে—তাই কোন তরল পদার্থের সংস্পর্শে ঐ কাগজটি এলে তরল পদার্থটিকে সেই সব শোষক কোষগুলি টেনে নেয়। এই কারণেই ব্লটিং পেপার কালি শুষে নেয়। লেখবার কাগজ কালি টানে না ঐ ভাবে, তার কারণ ঐ সমস্ত কাগজগুলির বায়ুভর্ত্তি কোষগুলিকে রোলারের চাপে চেপ্টে বায়ুশূন্য ও মসৃণ ক'রে দেওয়া হয়।

গরমে দুধ টকে যায় কেন ?

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রবার্ট হাচিন্‌সন্ বলেন যে, দুধে ল্যাক্‌টিক্ এ্যাসিড্ বর্ত্তমান থাকার জন্যেই দুধ টকে যায়। এই ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড্ দুধে উৎপন্ন হয় নানা কারণে। প্রথমতঃ দুধে সব সময়ে 'ব্যাকটেরিয়া ল্যাক্‌টিস্' নামে জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা বাইরের আবহাওয়ার উত্তাপে আকারে ও সংখ্যায় বাড়ে এবং তার ফলেই বেশী গরম পড়লে দুধে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের ভাগটা বেড়ে যায়, তাতেই দুধ টকে যায়।

'লঙ্কা' ঝাল হয় কেন ?

লঙ্কার ভেতরে যেখানে লঙ্কার বীচিগুলো আটকানো থাকে, সেখানে 'গ্লুকোসাইড' (Glucoside) বলে এক রকম পদার্থ জমানো থাকে। ঐ 'গ্লুকোসাইড' জিনিসটাতে ঝাঁঝালো ও ঝাল স্বাদের একরকম উদ্বুক্ত তেল (Volatile oil) থাকে, তার থেকেই লঙ্কার ঐ ঝাল-স্বাদের জন্ম। এই 'গ্লুকোসাইড' জিনিসটি মরিচ, পিপুল ও আরও বহু ফল ও বীজে থাকে এবং সেগুলির স্বাদও সেইজন্য ঝাল হয়।

সোনার চেয়ে দামী ধাতু কি কি ?

সোনা সব চেয়ে দামী ধাতু নয়। সোনার চেয়ে বেশী দামী ধাতু বলতে বোঝায়—১। বেরিল্লিয়াম (Beryllium) ২। প্লাটিনাম (Platinum) ৩। রেডিয়াম (Radium) ৪। প্যাল্লাডিয়াম (Palladium)

৫। অস্‌মিয়াম্ (Osmium) ৬। ইরিডিয়াম (Iridium) ৭। ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)।

দুধে লেবুর রস দিলে ছানা কেটে যায়, আর দম্বল দিলে দই হয়ে যায় কেন?

এর কারণ হচ্ছে, ছানা কাটার ব্যাপারটা আসলে ঘটে লেবুর রসে যে এ্যাসিড্ থাকে তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় দুধের 'কেসিন' (Casein) অংশ আলাদা হয়ে যায়। আর দম্বল দিলে দই হয়ে যায় সেটা হচ্ছে জীবাণুদের কাণ্ড—দইয়ের দম্বলে যে 'ল্যাক্‌টাস্' জীবাণু থাকে তা তো আগেই পড়েছ।

মাকড়সার জাল কি ক'রে তৈরী হয়?

মাকড়সার শরীরের পিছন দিকে একটি অংশ আছে, যেখানে এক রকম চটচটে আঠার মত জিনিস আপনা থেকেই তৈরী হয় এবং সেই রস বার হওয়ার জন্মে সেখানে 'স্পিনারেটস্' (Spinnerets) ব'লে কতকগুলি নালী আছে। মাকড়সার শরীরের ঐ অংশে রস তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে যখন তখনই বাহিরের হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়ে সব সরু রেশমের সূতার আকার নেয়। মাকড়সারা ঐ সূতার মত জিনিসটাকে তাদের পায়ের সাহায্যে বিছিয়ে দিয়ে জাল বোনে।

'পাঁউরুটি' কি ক'রে অত ফোলে?

এর কারণ, পাউরুটির ময়দাতে 'ঈষ্ট' (Yeast) ব'লে একরকম পদার্থ দেওয়া হয়। এই 'ঈষ্ট' পদার্থটিতে 'মণ্ডাণু' থাকে এবং তার ফলে রুটির ময়দাতে যে কার্ব্বোহাইড্রেট থাকে—তাতেই এর প্রক্রিয়ায় 'পচন' ক্রিয়া শুরু হয়। কাজেই 'ঈষ্ট' মাখানো ময়দার তাল আগুনের উত্তাপে রাখলে ময়দার ভেতরের 'কার্ব্বন ডায়ক্সাইড' গ্যাসটা বিস্তার লাভ করে, ফলে পাঁউরুটি অত বেশী ফুলে ওঠে।

কাঠ জলে বা খোলা জায়গায় রাখলে পচে কেন?

তার কারণ, কাঠটা আসলে মরা গাছ। মাছ, মানুষ, জীবজন্তু যতক্ষণ

বেঁচে থাকে, ততক্ষণ তার 'জীবনীশক্তি' তাকে নানারকম জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা 'জীবনীশক্তি' হারায়—তখনই জয়ী হয় জীবাণুরা। ঠিক এই ব্যাপারটা ঘটে 'মরা গাছ' বা কাঠে। নানারকম 'ব্যাক্টেরিয়া' বা জীবাণু তখন কাঠকে আক্রমণ করে বা কাঠের গায়ে 'ফান্‌জি' বা শ্যাওলা জাতের সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ কাঠের ভেতর বেড়ে উঠে কাঠকে অন্তঃসার-শূন্য ক'রে ফেলে—খোলা হাওয়া ও জলের মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, তাই কাঠ এইভাবে পচে বা ক্ষয় হয়।

'মুক্তা' কি ক'রে ঝিনুকের ভেতর জন্মায়?

'ঝিনুক' বা 'শুক্তি' জাতীয় জীবের শক্ত খোলার ভেতরটা একরকম হড়্‌হড়ে সাদা রসে সব সময় ভিজে থাকে; এই সাদা রসের আবরণটা ঝিনুকের ভেতরের নরম দেহটিকে ঐ শক্ত খোলার সঙ্গে ঘষাঘষির আঘাত থেকে রক্ষা করে। এই আবরণটাকে বলে ন্যাক্‌রে (Nacre) বা 'মাদার অব পার্ল'। এই সাদা রসটাই শুকিয়ে ঝিনুকের খোলার ভেতরটিতে অমন সুন্দর চক্‌চকে রূপালী একটি মসৃণ আবরণের সৃষ্টি করে যে, তা তোমরাও দেখেছ—এখন 'মুক্তার' জন্মটাও ঐ রস থেকে হয়। কি ক'রে? যে সব ঝিনুকের দেহের ভেতরে খুব ছোট বালুকণা ঢুকে যায়, সে সব ঝিনুকের ভেতরে তখন ঐ ছোট বালুকণা একটি অস্বস্তির সৃষ্টি করে; কিন্তু ঐ হড়্‌হড়ে রসটা বা 'ন্যাক্‌রে'টা যখন ঐ বালুকণার চারধারে লেগে বালুকণাটিকে ঢেকে দেয়, তখন আর ঝিনুকের ভেতরটাতে অস্বস্তি থাকে না, এই ভাবে ক্রমশঃ ঐ রস জমে জমেই বালুকণাটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে এবং সেটা তখন ঝিনুকের খোলার ভেতরে লেগে যায়। ঐটাকেই বলি আমরা 'মুক্তা'।

খবরের কাগজের নীচে এ. পি. (A. P.) ও ইউ. পি. (U. P.) বা P. T. I. লেখা থাকে কেন?

খবরের কাগজের খবরের নীচে 'এ. পি.' বা 'ইউ. পি.' লেখা থাকে

এইজন্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' (Associated Press) ও 'ইউনাইটেড প্রেস' (United Press) নামে যে দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে, ও কথা দুটি তাদেরই ইংরাজি নামের সংক্ষিপ্ত চেহারা। 'এ. পি.' দেখলেই বুঝবে খবরটি কাগজওয়ালারা পেয়েছে 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' কাছ থেকে, আর 'ইউ. পি.' দেখলে বুঝবে 'ইউনাইটেড প্রেস' বলে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া খবর। 'রয়টার' লেখা থাকলে বুঝতে হবে—সেটা 'রয়টার' নামে যে খবর দেওয়ার প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা থেকে খবর পাঠাচ্ছে, খবরটা তাদের পাঠানো। সম্প্রতি ভারতের রয়টার প্রতিষ্ঠানটি Press Trust of India নামে একটি প্রতিষ্ঠানভুক্ত হয়েছে। তাই আজকাল খবরের কাগজের তলায় লেখা হচ্ছে P. T. I.

মানুষের মাথায় কত চুল আছে ?

এ প্রশ্নটা শুনলেই তোমরা হয়ত বলবে—'তা কি বলা যায় ?' সত্যি কথা, সঠিক গুণে বলা শক্ত যে, মানুষের মাথায় কতগুলি চুল আছে। কারণ মাথা তো সবারই সমান নয়, কারুর বড়, কারুর ছোট ; তবে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সাধারণতঃ মানুষের মাথায় গড়পড়তা ১ লক্ষ চুল থাকে। এই যে হিসাবটা তাঁরা পেয়েছেন, তা চুলগুলিকে একটি একটি ক'রে গুণে নয়। কি করে জান ? তাঁরা চুলের ব্যাস মেপে দেখেছেন যে, এক একটি চুলের ব্যাস হচ্ছে ১ ইঞ্চির ৪০০ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ চারশো চুল গোছা করলে এক ইঞ্চি ব্যাস পাওয়া যাবে এবং মাথার চুলওয়ালা অংশের মাপ কতো ইঞ্চি বার করলে সহজেই বলা যেতে পারে গড়পড়তা সেখানে কত চুল আছে।

বিভিন্ন দেশে—'মিষ্টার' (Mr.) 'মিসেস্' (Mrs.) ও 'মিস্' (Miss) এর পরিবর্তে কি শব্দ ব্যবহার হয় ?

এর জবাবে নীচের এই তালিকাটি দেখলেই সব বুঝতে পারবে—

ইংল্যাণ্ড	মিঃ (Mr).	মিসেস (Mrs)	মিস্ (Miss)
আলবানিয়া—	Zotni	Zonje	Zonjushe

জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া—	Herr	Frau	Fraulein
ফ্রান্স ও বেলজিয়াম—	Monsieur	Madame	Mademoiselle
বুলগেরিয়া—	Gospodin	Gospoja	Gospojitza
চেকোশ্লোভাকিয়া—	Pan	Pani	Sleena
সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে—	Herr	Fru	Froken
আয়ার্ল্যাণ্ড—	Uasal	Ban Uasal	Uasal
এস্তোনিয়া—	Harra	Prona	Preili
ফিন্‌ল্যাণ্ড—	Herra	Ronva	Neiti
গ্রীস—	Kyrios	Kyria	Thespaenis
হল্যাণ্ড—	Mijneer	Mevronw	Juffronw
হাঙ্গারী—	—Ur	—Ne	Kisasszony
ইতালী—	Signor	Signora	Signorina
স্পেন—	Senor	Senora	Senorita
ল্যাটভিয়া—	Kungs	Kundze	Janukundze
লিথুয়ানিয়া—	Ponas	Ponia	Panela
পোল্যাণ্ড—	Pan	Pani	Panne
পর্ত্তুগাল—	Senhor	Senhora	Senhorita
রুশিয়া—	Grashdanin	Grashdanka	Grashdanka
রুমানিয়া—	Domnul	Domna	Domnisoara

বিভিন্ন দেশের প্রধান মুদ্রার নাম কি ?

কয়েকটি দেশের মূল অথবা প্রধান মুদ্রার নাম জানাচ্ছি ; মূল মুদ্রা বলতে যেমন আমাদের দেশে 'টাকা' বোঝায়, তেমনি এক এক দেশের নামকরা মূল মুদ্রাটির নামই শুধু দিচ্ছি—সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে যে মুদ্রা চলে বেশী, তার নাম 'ফ্রাঙ্ক', তবে তিনটি দেশের 'ফ্রাঙ্ক

তিন রকম দেখতে। তুরস্কের প্রধান মুদ্রার নাম 'পিয়াস্ত্রে' (Piastre)। ইতালীর প্রধান মুদ্রা হচ্ছে 'লীরা' (Lire)। রুশিয়ার প্রধান মুদ্রার নাম 'রুব্‌ল' (Rouble)। স্পেনের প্রধান মুদ্রা হচ্ছে 'পেসেতা'। জার্ম্মানীর প্রধান মুদ্রা হচ্ছে "মার্ক' (Mark)। চেকোশ্লোভাকিয়ার মুদ্রার নাম কোরুণা (Koruna)। রুমানিয়ার মুদ্রা হচ্ছে 'লিউ' (Lei)। জাপানের মুদ্রা 'ইয়েন' (Yen)। চীনদেশের মুদ্রা হচ্ছে 'ইয়য়ান' (Yuan)। ফিনল্যাণ্ডের মুদ্রা 'মার্ক' (Mark)। আইসল্যাণ্ডের মুদ্রা 'ক্রোনা' (Krona)। সুইডেন ও ডেনমার্কের প্রধান মুদ্রা হলো 'ক্রোনার' (Kronor)। যুগোশ্লাভিয়ার মুদ্রা—'দিনার' (Dinar)। ভেনিযুয়েলার মুদ্রা —'বলিভার' (Boliver)। উরুগুয়ের ও মেক্সিকোর মুদ্রা— 'পেসো' (Peso) ; ইরাণের প্রধান মুদ্রা হচ্ছে 'রিয়াল' (Rial)। গুয়াটেমালার প্রধান মুদ্রা—'কোয়েৎসাল' (Quetzal) ; থাইল্যাণ্ডের মুদ্রার নাম—'বাহ্‌ত' (Baht)। পর্ত্তুগালের মুদ্রার নাম 'এস্কুডো' (Escudo)। পোল্যাণ্ডের মুদ্রা হচ্ছে 'জ্লোটি' (Zloti)। পেরুর মুদ্রার নাম 'সল' (Sol)। পানামার মুদ্রার নাম 'বালবোয়া' (Balboa)। নরওয়ের মুদ্রা—'ক্রোন' (Krone), নেদারল্যাণ্ডের মুদ্রা—'গিল্ডার' (Guilder)।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রয়াল একাডেমীর চিত্রপ্রদর্শনী কোথায় হয় ?

এক সময়ে এই চিত্রপ্রদর্শনী হতো ট্রাফল্‌গার স্কোয়ারস্থিত ন্যাশন্যাল গ্যালারী নামে চিত্র সংরক্ষণাগারে। কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বার্লিংটন হাউসে এই চিত্রপ্রদর্শনী স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ইরাকের পাইপ-লাইন কি ?

ইরাকের পেট্রলের খনি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সহজে নেওয়ার জন্য মাটির তলা দিয়ে যে পাইপ বসান হয়েছে—তাকেই বলা হয় পাইপ-লাইন। এই পাইপ-লাইনের প্রথম অংশের উদ্বোধন করেন ইরাকের রাজা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী—এই পাইপলাইনের একটি মুখ শুরু হয়েছে প্যালেষ্টাইনের 'হাইফা' শহরে, শেষ হয়েছে

সিরিয়ার ট্রিপলি নগরে। এই পাইপ-লাইনের শাখা-প্রশাখা সমেত মোট মাপ হচ্ছে ১১৫০ মাইল। তৈরী করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এই পাইপ দিয়ে বছরে গড়ে ৪০ লক্ষ টন পেট্রল চালান হয়।

বোল্ডার ড্যাম্ (Boulder Dam) কি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ যা দিয়ে মানুষ নদীকে বেঁধেছে সেটাই হচ্ছে এই 'বোল্ডার ড্যাম্' বা বাঁধ। এই বাঁধটি আমেরিকার কলোরেডো নদীর ব্ল্যাক ক্যানিয়ন অংশে গাঁথা হয়েছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ এই বাঁধটি তৈরী শেষ হয়। এটি ৭২৬ ফুট উঁচু—এই বাঁধটির উপরকার ক্ষেত্রের চওড়া মাপ হচ্ছে ৪৫ ফুট। এই বাঁধটি বর্ত্তমানের পূর্ত্তবিদ্যা বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

সমাপ্ত



বর্ণানুক্রমিক প্রশ্ন-সূচী

অ

আ

ই

উ

এ

ও

ক

খ

গ

প

ভ

ম

স

হ